২০২৫-এর মেডিকেলে ৫০০ এবং তার বেশি নম্বর পাওয়া

৪৭৪

সাফল্যের আলোকবর্তিকা ২০২৫

আল-আমীন মিশন

খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া

Al-Ameen Mission 39 Years in service to the society

Al-Ameen Mission Trust

আল-আমীন মিশন

ইন্সটিটিউট ফর এডুকেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং

আল-আমীন মিশন ট্রাস্ট পরিচালিত দ্য সেন্টার অফ এক্সেলেন্স

প্রকল্পটি নির্মাণাধীন। নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬।

এটি সিভিল সার্ভিস, নিট (ইউজি এবং পিজি), জেইই-আইআইটি ও আইআইএম প্রত্যাশীদের জন্য আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সেইসঙ্গে এটি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং প্রশাসনিক কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের একটি উৎকৃষ্ট কেন্দ্র হবে। থাকবে সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞানের একটি গবেষণা কেন্দ্র। গবেষকদের থাকার ব্যবস্থাও হবে একই ছাদের তলায়।

সাফল্যের আলোকবর্তিকা ২০২৫

সর্বভারতীয় আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল কোর্সে ভর্তির পরীক্ষায় এ-বারও আল-আমীন মিশনের জয়জয়কার।
প্রায় পাঁচশো সফল পরীক্ষার্থীর মধ্যে ষাট জনের সংগ্রাম ও সাফল্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিয়ে
এই পুস্তিকাটি ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে রচিত।

সম্পাদনা

সেলিম মল্লিক শেখ হাফিজুর রহমান

লেখা

একরামুল হক শেখ আসাদুল ইসলাম

গ্রাফিক্স: মহম্মদ গোলাম কিবরীয়া

বর্ণস্থাপন: ফিরোজ খান

আল-আমীন মিশন ট্রাস্টের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম কর্তৃক প্লট নং ডি জে ৪/৯, অ্যাকশন এরিয়া ১, নিউটাউন
কলকাতা ৭০০ ১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং ডায়মন্ড আর্ট প্রেস ৩৭এ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৬৯ থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৭৬, ওয়েবসাইট: www.alameenmission.org, ই-মেল: alameenmission@yahoo.com।

সূচিপত্র

সৈয়দ মহম্মদ তামজিদ ৫
আরাফাত হোসেন ৬
শরিফ হাসান ৭
সামিমা বিশ্বাস ৮
সেখ নিলয় ইসলাম ৯
আইনাল কবির ১০
রিজওয়ানুল আরেফিন ১১
আবদুল রাজেব সেখ ১২
লুবনা ফারহাদ মণ্ডল ১৩
রনি মণ্ডল ১৪
সাহারুল সেখ ১৫
রহিমা খাতুন ১৬
মহম্মদ ইনতিয়াজ হক ১৭
মহম্মদ সারওয়ার একবাল ১৮
মহম্মদ মেহেবুব মুর্শিদ ১৯
সেখ সাহানাজ ২০
মহম্মদ ওমেদুল্লা ২১
মাউসুফ তামীম ২২
সেখ জিনাতুল্লাহ হোসেন ২৩
রেশমা সুলতানা ২৪
সেরাজুদ্দিন সেখ ২৫
রনি সেখ ২৬
ওয়াসিম সাফাজ ২৭
তসলিমা নাসরিন ২৮
নাসরিন সুলতানা ২৯
সামিম সেখ ৩০
মহম্মদ ওমর ফারুক মণ্ডল ৩১
সেক আরেফুল ৩২
সুফি ইরাদা ৩৩
মহম্মদ সোহেল গাজী ৩৪
ইসমাত ফরজানা খানম ৩৫
রাফিনা খাতুন ৩৬
সুমি হাসান ৩৭
ইলহাম মানসিজ ৩৮
সানিয়া ইসলাম ৩৯
বুশরা খাতুন ৪০
মহম্মদ সাকিব মোমিন ৪১
শাহনওয়াজ পারভীন ৪২
সোহাইল জামিল ৪৩
সেখ যায়েদ ইফতিখার ৪৪
আব্দুল খালেক ৪৫
সেখ আতিয়ার রহমান ৪৬
মহম্মদ সাইমনুল হক ৪৭
মির্জা নাজীব হাসান ৪৮
আকাশ মণ্ডল ৪৯
মোনালিসা পারভীন ৫০
মোসাম্মাদ আনজিরা খাতুন ৫১
বাহারুদ্দিন সেখ ৫২
আলিশা সরদার ৫৩
সাইদা পারভীন ৫৪
নওশিন বিন্তি ৫৫
কুলসুম খাতুন ৫৬
সালমা রহমান ৫৭
নার্গিস পারভীন ৫৮
হাদিমুল হক ৫৯
নিশাত নাজিফা ৬০
শুকতারা খাতুন ৬১
নাজমা নাসরিন ৬২
মহাবাতুন নেশা ৬৩
রুবিনা খাতুন ৬৪

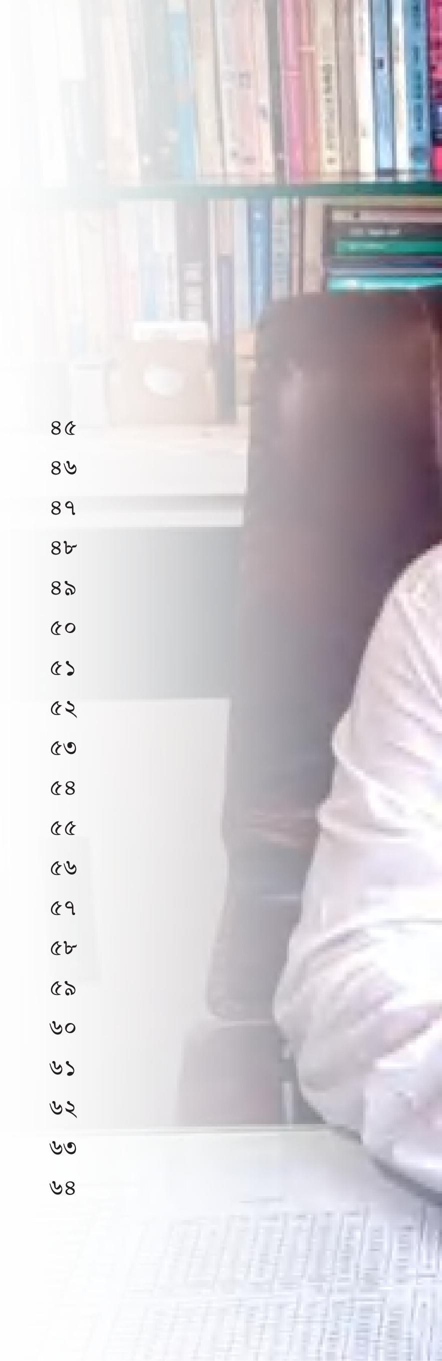

ভূমি থেকে আকাশ পর্যন্ত মানুষের বিস্তার। স্রষ্টা মানুষকে এতটাই বিস্তৃত হওয়ার শক্তি দিয়েছেন। দিয়েছেন, কিন্তু প্রকাশ্য নয়, তা রয়েছে মর্মে, অন্তর্নিহিত হয়ে। সেই শক্তিকে ইচ্ছা, অনুশীলন আর স্বপ্নের সাহায্যে আশমানের মতো ব্যাপ্ত করে সার্থক করে তোলার যে-ক্রিয়া, তা-ই হল শিক্ষা। শিক্ষা ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তাকে বিরাট করে, সেই বিশালতায় অভিভূত হয় দুনিয়া। শিক্ষা গোটা বিশ্বের সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র। শিক্ষার এই পরম তাৎপর্যকে আল-আমীন মিশন সমগ্র অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে চায়, সঞ্চার করতে চায় মিশনের সমস্ত পড়ুয়ার মধ্যে।

তবু, শিক্ষার অন্য আরেক গুরুত্ব আছে, বাস্তবিকই কঠিন এই পৃথিবীর রোজকেরে জীবনের মোকাবেলায় দরকার কাজ, অর্থ এবং সম্মান— সেই বাস্তবতাকে আল-আমীন শুরু থেকেই মূল্য দিয়ে চলার পক্ষ নিয়েছে। মূক মুখে ভাষা জোগানোর মতো 'হীন বুকে' বল দেওয়া মিশনের লক্ষ্য। আর শিক্ষাকে সিঁড়ি বানিয়ে তা সম্ভব। আল-আমীন বিশ্বাস করে শিক্ষাই ওপরে ওঠার সবচাইতে শক্ত সোপান।

এসবের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় প্রতিবছরের বিভিন্ন পরীক্ষাতে মিশনের পড়ুয়াদের রেজাল্টের দিকে তাকালে, যা ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী।

এই সংকলনে লেখা হয়েছে এ-বছর নিট (ইউজি)-এ র‍্যাঙ্ক-করা মিশনের ৬০ জন পড়ুয়ার অদম্য অধ্যবসায় ও জীবনসংগ্রামের কথা। যদিও ৬০ জনের সংখ্যাটি অল্পই। পাঁচশো এবং তার ওপর নম্বর পাওয়া মিশনের ৪৭৪ জন পড়ুয়া শীর্ষস্থানীয় সরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তির ছাড়পত্র পেয়েছে। তাদের অনেকেরই পারিবারিক দারিদ্র্য এবং অসহায়তাকে মুছিয়ে পূর্ণ মমতা ও দায়িত্বের সঙ্গে মিশন মেধার পরিচর্যা আর বিকাশে সাথ দিয়েছে। আমরা মনে করি, ওরাই মিশনের আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। আমরা উজ্জ্বল ওদেরই উজ্জ্বলতায়। সেই ঔজ্জ্বল্য আলোকিত করে জাতি-দেশ-পৃথিবীকে। এভাবে আলো ছড়িয়ে দেওয়া আসলেই আল্লাহ্‌র এবাদত— তাঁরই অব্যক্ত ইচ্ছার আন্তরিক বাস্তবায়ন। এই পথে অনুপ্রাণিত হোক অনুজাতরা, এ-ই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ জানাই সেইসব মহানুভব মানুষকে, যাঁরা দশকের পর দশক ধরে আল-আমীন মিশন এবং মিশনের উদ্দেশ্যের প্রতি সহৃদয় থেকে সঙ্গে রয়েছেন।

এম নুরুল ইসলাম
প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, আল-আমীন মিশন

খলতপুর, হাওড়া
সেপ্টেম্বর ২০২৫

সৈয়দ মহম্মদ তামজিদ

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২৪০

এইমস, ভুবনেশ্বর

আল-আমীন মিশন থেকে ২০২৫ সালে ৫০০-র বেশি নম্বর পেয়ে ৫২৬৭২ র‍্যাঙ্কের মধ্যে আছে ৪৭৪ জন। এই শ-পাঁচেক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে সবার ওপরে আছে সৈয়দ মহম্মদ তামজিদের নাম। এ-বারের নিট পরীক্ষায় সে ৬৩০ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় স্তরে র‍্যাঙ্ক করেছে ২৪০। সারাভারতের সেরা মেধাবী প্রায় ২৫ লাখ পরীক্ষার্থীর মধ্যে সে ২৪০-তম স্থানাধিকারী। এবং আরও আনন্দের বিষয় হল রানিঙে সে এই র‍্যাঙ্ক করেছে। অর্থাৎ, আলাদা করে নিট প্রস্তুতির জন্যে সময় ব্যয় না করে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করার বছরেই নিট পরীক্ষায় এমন দুর্দান্ত রেজাল্ট করেছে। শুধু তা-ই নয়, উচ্চ-মাধ্যমিকেও সে রাজ্য স্তরে র‍্যাঙ্ক করেছে। এ-বারের উচ্চ-মাধ্যমিকে রাজ্যে সে সপ্তম হয়েছে। তার অতীতও উজ্জ্বল। সে মাধ্যমিকে রাজ্যে ২০-তম স্থান পেয়েছিল। আল-আমীন মিশনে তামজিদ পড়েছে ক্লাস নাইন থেকে।

তামজিদের প্রকৃত বাড়ি বর্ধমানে হলেও পিতার কর্মসূত্রে থাকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গড়িয়া থানার দক্ষিণ কন্দর্পপুর গ্রামে। পিতা সৈয়দ মহম্মদ তাহির সরকারি স্কুলের ক্লার্ক। তিনি বি.এসসি. পাস। মা জাহানারা বেগম গ্র্যাজুয়েট। তিনি গৃহিণী, কোনো চাকরিবাকরি করেন না। তামজিদের দাদা সৈয়দ মহম্মদ তামিম মিশনেরই ছাত্র ছিল। মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকে রাজ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করে এবং রানিঙে ২০২২ সালে নিট পরীক্ষায় পেয়েছিল ৬৫০ নম্বর। দুই সন্তানের মধ্যে প্রথম জনের দুর্দান্ত রেজাল্ট হওয়ার পরে দ্বিতীয় জনের জন্যেও আল-আমীন মিশনকে বেছে নেন তাহির সাহেব। তাহির সাহেবের দ্বিতীয় সন্তান তামজিদ ক্লাস নাইনে মিশনে আসার আগে গড়িয়ার একটা বাংলা মাধ্যম বেসরকারি স্কুলে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। মিশনের খলতপুর শাখায় দু-বছর পড়ার পরে ২০২৩ সালে মাধ্যমিকে তামজিদ পায় ৯৬.১৪ শতাংশ নম্বর। রাজ্যে ২০-তম স্থান পায়। এর পর ২০২৫ সালে উচ্চ-মাধ্যমিকে ৯৮.২ শতাংশ নম্বর পেয়ে রাজ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করে।

তামজিদ কীভাবে নিটের প্রস্তুতি নিয়েছে, নিজের প্রস্তুতির নিরিখে আগামী দিনে যারা নিট দেবে তাদের কী পরামর্শ দেবে— এসব প্রশ্নে সে বেশ কিছু টিপস দিয়েছে। তার মতে, “প্রথম দিকে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে নাও, টেস্টে কত নম্বর পাচ্ছ সেটা দেখো না। ডাউট থাকলে ক্লিয়ার করো। কেন হচ্ছে প্রশ্ন করো। এটা করলে প্রথম দিকে নম্বর বেশি না পেলেও শেষের দিকে ভালো নম্বর পাবে। কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকলে রিভিশন করতে সুবিধা হবে। আর বেশি বেশি করে মকটেস্ট দাও। এর ফলে টাইম ম্যানেজ আর প্রেসার ম্যানেজ, দুটোতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।”

তামজিদ বেশি গুরুত্ব দিয়েছে পড়াশোনার পরিবেশকে। তার মতে আল-আমীন মিশনের যেটা সবচেয়ে ভালো, সেটা হল পড়াশোনার পরিবেশ। এর সঙ্গে আছে বন্ধুদের সঙ্গে গ্রুপ স্টাডি। চিকিৎসক হতে চলা তামজিদের প্রিয় বিষয় বায়োলজি। ক্লাসের পড়াশোনার বাইরে সে গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে। ভবিষ্যতে সে এন্ড্রোক্রনোলজিস্ট হতে চায়। কারণ, বর্তমানে ঘরে ঘরে থাইরয়েড, সুগারের রোগী। ভালো চিকিৎসক হতে পারলে অনেক মানুষের সুচিকিৎসা করা যাবে।

তামজিদ এইমস, ভুবনেশ্বরে ভর্তি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এ-বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ জন বাঙালি ছাত্র-ছাত্রী সুযোগ পেয়েছে এখানে। তার মধ্যে তিন জন সংখ্যালঘু মুসলমান পড়ুয়া।

তামজিদ মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে সংবর্ধনা গ্রহণ করেছে। ■

আরাফাত হোসেন

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৩৩০

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

এক সাধারণ পরিবারের সন্তান আরাফাত হোসেন। কিন্তু, তার জীবনের স্বপ্ন আর-পাঁচটা সাধারণ ছেলে-মেয়ের মতো নয়। মালদার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্র হয়েও সে প্রমাণ করে দিয়েছে ইচ্ছাশক্তি ও কঠোর পরিশ্রম থাকলে কোনোকিছু অর্জন অসম্ভব নয়। মালদা জেলার গাজোল থানার দক্ষিণ আলিনগর গ্রামের ছেলে আরাফাত ২০২৫ সালের নিট (ইউজি) পরীক্ষায় ৬২৫ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় স্তরে ৩৩০ র‍্যাঙ্ক করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। শৈশবকাল থেকে লালিত ডাক্তারি পড়ার স্বপ্ন শুধু সে সফল করেনি, উজ্জ্বল র‍্যাঙ্ক করে পরিবার ও নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মুখ উজ্জ্বল করেছে।

আরাফাত হোসেন পঞ্চম শ্রেণি থেকে মিশনের মহম্মদপুর শাখায় পড়াশোনা করেছে। ওই শাখা থেকে ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৬২ নম্বর (৯৪.৬ শতাংশ) এবং খলতপুর শাখা থেকে ২০২৫ সালের উচ্চ-মাধ্যমিকে ৪৯২ নম্বর (৯৮.৪ শতাংশ) পেয়ে সকলের নজর কাড়ে। রানিং ইয়ারেই সে মেডিকেলে চমৎকার সাফল্য পেয়েছে। তার পছন্দের বিষয় ফিজিক্স। ডাক্তারি পড়তে সুযোগ-পাওয়া আরাফাতের ভবিষ্যতের লক্ষ্য হল হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ হওয়া। অনেকেই নিজের লক্ষ্য নিয়ে দ্বিধান্বিত থাকে, সেখানে আরাফাত স্পষ্টভাবে জানে সে কী হতে চায়।

তার সাফল্যের রহস্য— সেল্ফ স্টাডি এবং প্র্যাকটিশ। সে জানে নিজের ওপর বিশ্বাসই সবচেয়ে বড়ো শক্তি।

> **আরাফাত ২০২৫ সালের নিট (ইউজি) পরীক্ষায় ৬২৫ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় স্তরে ৩৩০ র‍্যাঙ্ক করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। উজ্জ্বল র‍্যাঙ্ক করে পরিবার ও নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মুখ উজ্জ্বল করেছে।**

অভাব-অনটনের মধ্যেও যখন মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়া পিতা মোস্তফা হোসেন কৃষিকাজ করে কোনোমতে সংসার চালান। উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়া মা রেবিনা খাতুন সাধারণ গৃহবধূ। সংসারে সচ্ছলতা না থাকলেও আরাফাত হতাশ হয়ে পিছিয়ে পড়েনি। সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে তার পাশে যেমন থেকেছেন তার পরিবার, তেমনি পাশে থেকেছে তার আর-এক পরিবার— আল-আমীন মিশন। সেই ক্লাস ফাইভ থেকেই নামমাত্র বেতনে মিশনে পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছে সে। মেধাবী আরাফাত সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজের নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে স্বপ্নকে ছুঁয়ে ফেলার নজির তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। আরাফাতের একমাত্র বোন নিলুফা পারভীনও আল-আমীন মিশনে পড়ছে। একই পরিবারের দুই সন্তানের এক জন ডাক্তার হওয়ার ছাড়পত্র আদায় করে নিল এ-বছর, উচ্চ-মাধ্যমিকে পাঠরতা অপরজনও ভালো ফল করে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে বলে আশাবাদী তাদের মা-বাবা। আরাফাত ও নিলুফার হাত ধরে তাদের পরিবারে যে দিনবদলের গল্প রচিত হতে চলেছে, নিঃসন্দেহে সেখানে আল-আমীন মিশন অন্যতম উজ্জ্বল অংশ হয়ে থাকবে। ■

শরিফ হাসান

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১২১৮

এইমস, কল্যাণী

পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক জেলা হল মুর্শিদাবাদ। এই জেলারই এক শান্ত, সবুজ গ্রাম গুধিয়া। এই গ্রামের মাটির গন্ধ গায়ে মেখে, আর-দশটা সাধারণ ছেলের মতোই বেড়ে উঠছিল শরিফ হাসান। কিন্তু, তার চোখে ছিল এক অসাধারণ স্বপ্ন— ডাক্তার হওয়া তথা মানুষের সেবা করার স্বপ্ন। পরিবারের কর্তা শরিফের পিতা মাসাদুল শেখ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাষের কাজ করেন। সেই সামান্য উপার্জনকে সম্বল করেই শরিফের মা সারিকা বিবি নিজের সংসারটা সামলান। এমন একটা পরিবারে বড়ো স্বপ্ন দেখাটাই একটা বিরাট সাহসের ব্যাপার। এমন পরিবারের ছেলে-মেয়েদের ডাক্তার হওয়ার মতো স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্যে প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম, আত্মত্যাগ এবং অটল সংকল্প। শরিফ সেই পথই বেছে নিয়েছিল।

শরিফের সাফল্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল কীভাবে? শোনা যাক তার মুখ থেকেই— “আমি অত্যন্ত নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসেছি। কিন্তু তার মাঝেও আমার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পেছনে কোনো সমস্যা হয়নি শুধুমাত্র আল-আমীন মিশনের সহযোগিতার জন্যে। সেই ক্লাস এইট থেকেই মিশন আমাকে খুব সামান্য বেতনে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছে। আল-আমীন মিশন না থাকলে হয়তো আমি এই সাফল্য অর্জন করতে পারতামই না। ক্লাস ওয়ান থেকে সেভেন পর্যন্ত আমি গুধিয়া হাই স্কুলে পড়াশোনা করেছি। কিন্তু পড়াশোনায় তেমন ভালো ছিলাম না। ক্লাস এইটে প্রথম আল-আমীন মিশনের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে ভর্তি হয়ে যাই মিশনের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উস্থি শাখায়। তারপর লকডাউন এসে গেলে আমার পড়াশোনা একেবারে খারাপ হয়ে যায়। ক্লাস টেনে আমার রোল নম্বর ছিল ৩৯, যেখানে ছাত্র ছিল ৪২ জন। ২০২২ সালের মাধ্যমিকে আমার ফল একটু ভালো হয়, ৯২.৪ শতাংশ নম্বর। পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী হওয়ার পরে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি, শুধুমাত্র Consistency বা ধারাবাহিক একইরকম পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার কারণে। গতবছর উচ্চ-মাধ্যমিকে আমি ৯২.৬ শতাংশ নম্বর পাওয়ার পাশাপাশি নিট পরীক্ষায় পেয়েছিলাম ৬০৭ নম্বর। র‍্যাঙ্ক অনেক পেছনে থাকায় গতবছর ওই নম্বর পেয়েও এম.বি.বি.এস. পড়ার স্বপ্ন অধরা থেকে গিয়েছিল। এ-বছর সেই স্বপ্ন শুধু পূরণ হল না, অনেক ভালো কলেজে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছি।” উল্লেখ্য, শরিফ এ-বার নিট পরীক্ষায় ৬০২ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় স্তরে ১২১৮ র‍্যাঙ্ক করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

শরিফের পাওয়া নম্বরগুলো নিছক কোনো পরিসংখ্যান নয়, বরং এর পেছনে লুকিয়ে আছে প্রতিরাতের নিরলস অধ্যবসায়। ভবিষ্যতে নিউরো সার্জন হতে চাওয়া শরিফ জানিয়েছে, “সমস্ত স্টুডেন্টের মধ্যেই পড়াশোনা করার ও সাফল্য পাওয়ার ক্ষমতা আছে। কিন্তু, কোন পদ্ধতিতে পড়লে সফল হবে তা ঠিক করতে অনেক সময় লেগে যায়। জীবনযুদ্ধে জিততে হলে নিজেকেই নিজের অস্ত্র খুঁজে নিতে হবে। শিখতে হবে তার উপযুক্ত ব্যবহার।” তার নিজের সাফল্যের মন্ত্রের কথা জানতে চাওয়ায় শরিফ জানিয়েছে, “পড়াশোনায় সাফল্যের একটি অন্যতম মন্ত্র হল ১, ২, ৮ পদ্ধতি ও কনসিসটেন্সি। একটি বিষয় প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন ও অষ্টম দিনে পড়লে তা মনে থাকে অনেক দিন। আর যেভাবে পড়বে তা যেন একই ধারাবাহিকতা মেনে হয়।” ■

সামিমা বিশ্বাস

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২৭৬৪

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

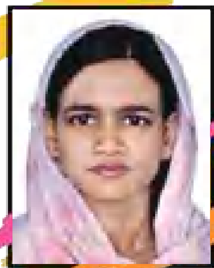

সাফল্যের প্রতিটি গল্পের পেছনে থাকে একটি স্বপ্ন, আর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্যে থাকে দৃঢ় সংকল্প এবং অসংখ্য ত্যাগ। মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থানার হুকেরহাট গ্রাম থেকে উঠে আসা সামিমা বিশ্বাসের গল্পটিও ঠিক তেমনই এক উপাখ্যান। তবে তার স্বপ্নটি আর-দশ জনের মতো শুধু ডাক্তার হওয়ার নয়, এর সাথে জড়িয়ে আছে এক মহৎ উদ্দেশ্য— স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হয়ে সমাজে নারীস্বাস্থ্যের উন্নতিতে অবদান রাখা। তার ভাবনা থেকেই বোঝা যায়, সামিমার লক্ষ্য শুধু একটি সম্মানজনক পেশায় জীবন কাটানো নয়, বরং সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের কথা ভেবে নিজের জীবনকে নিয়োজিত করা।

সামিমা ছোটো থেকেই পড়াশোনায় মেধাবী। তার বাবা-মা দু-জনেরই পড়াশোনা উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত। বাড়িতে আর-এক বোন আছে সামিমার। ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান সামিমা আল-আমীন মিশনে পড়েছে ক্লাস এইট থেকে। পড়ত মিশনের ধুলিয়ান শাখায়। ২০২২ সালে মাধ্যমিকে ৯২.৮ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে উচ্চ-মাধ্যমিকে ৯৩ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করে। সেই মজবুত ভিত্তির ওপর ভর করেই সামিমা নিটের মতো কঠিন পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি শুরু করে। ২০২৪ সালে, রানিং ইয়ারে সে পেয়েছিল ৫৪৪ নম্বর। গতবছর ডাক্তারি পড়ার স্বপ্ন সফল করতে না পারলেও তার প্রাপ্ত নম্বর বলে দিয়েছিল আর-একটা বছর মন দিয়ে পড়াশোনা করলেই সাফল্য অর্জন করতে পারবে। আল-আমীন মিশনের তত্ত্বাবধানেই কেবল নিটের জন্যেই আরও এক বছর কোচিং নেয় অঙ্কুহাটি শাখায়। সেই প্রস্তুতিকে সম্বল করেই এ-বছর সামিমা ৫৮৫ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় স্তরে ২৭৬৪ র‍্যাঙ্ক করেছে। আল-আমীন মিশন থেকে ২০২৫ সালের নিট পরীক্ষায় সফল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সামিমা চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে। মেয়েদের মধ্যে সে আছে প্রথম স্থানে।

সামিমা ৫৮৫ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় স্তরে ২৭৬৪ র‍্যাঙ্ক করেছে। আল-আমীন মিশন থেকে ২০২৫ সালের নিট পরীক্ষায় সফল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সামিমা চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে। মেয়েদের মধ্যে সে আছে প্রথম স্থানে।

সামিমা নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আগামী দিনে যারা নিট পরীক্ষায় বসবে তাদের পরামর্শ দিয়েছে। জানিয়েছে, "এটা এমনই একটা জার্নি, যেখানে হতাশ বা নিরাশ হলে চলবে না। আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রেখে লেগে থাকতে হবে। প্রত্যেক বিষয়ের পড়াশোনার জন্যে একটা ঠিক পদ্ধতি তৈরি করে নিতে হবে। যেমন ফিজিক্সে যত বেশি সম্ভব কোশ্চেন প্র্যাকটিশ করতে হবে। বায়োলজিতে এনসিইআরটি-র প্রত্যেকটা লাইনই গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে। কোনো টেস্ট পরীক্ষায় কম নম্বর এলে মনখারাপ না করে কোশ্চেন অ্যানালিসিস করতে হবে বেশি করে। এভাবে যত বেশি টেস্ট দিয়ে নিজের ভুল শুধরে নিতে পারবে তত সাফল্যের কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব হবে।" ■

সেখ নিলয় ইসলাম

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৩০৭৪

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

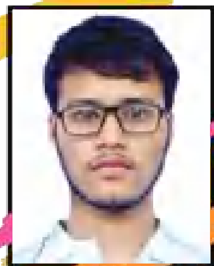

মালদার কালিয়াচক, মেদিনীপুরের কেশপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাঙড়, উত্তর চব্বিশ পরগনার শাসন— পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বেশ কিছু এমন এলাকা সম্পর্কে রাজ্যের মানুষের একটা নেতিবাচক ধারণা আছে। সেটা যে একদমই অমূলক, তাও নয়। কিন্তু সেই প্রচলিত ধারণা বেশ কয়েক বছর ধরে নীরবে বদলে যাচ্ছে। ভেতরে ভেতরে বহু মেধাবী ছেলে-মেয়ে পড়াশোনার জগতে চমকপ্রদ সাফল্য পেয়ে এলাকার মুখ উজ্জ্বল করছে। এবং এ-ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ওইসব এলাকার সফল ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অনেকের সাফল্যের পেছনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে আল-আমীন মিশন। উদাহরণ হিসেবে সেখ নিলয় ইসলামের কথা বলা যায়। সে উত্তর চব্বিশ পরগনার শাসন এলাকার চোলপুর গ্রামের ছেলে। ২০২৫ সালের নিট (ইউজি) পরীক্ষায় সে ৫৮৩ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় স্তরে ৩০৭৪ র‍্যাঙ্ক করেছে।

নিলয়ের পিতা সেখ নাসিমুল ইসলাম ইতিহাসে স্নাতকোত্তর। তিনি হাই স্কুলের শিক্ষক। চাকরি পাওয়ার আগে শুরু করা হার্ডওয়্যার ব্যাবসাও আছে। নিলয়ের মা তুহিনা পারভিন বি.এ. পাস। তিনি গৃহবধূ। বাড়িতে আছে নিলয়ের আর-এক ভাই। সে ক্লাস নাইনে পড়ছে। সচ্ছল পরিবারের সন্তান হিসেবে নিলয় সম্পূর্ণ বেতন দিয়েই পড়াশোনা করেছে মিশনে।

নিলয় মিশনে নিটের কোচিং নেওয়ার জন্যেই ভর্তি হয়েছিল। আল-আমীন মিশনে মাত্র এক বছর কোচিং নেওয়ার পরে এ-বছর নিলয়ের র‍্যাঙ্ক হয়েছে ৩০৭৪। এই র‍্যাঙ্কের ভিত্তিতে সে রাজ্যের অন্যতম সেরা মেডিকেল ইনসটিটিউট কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছে।

নিলয় মিশনে নিটের কোচিং নেওয়ার জন্যেই ভর্তি হয়েছিল। তার আগে সে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনা করেছে উত্তর চব্বিশ পরগনার একটি আবাসিক মিশনে। মাধ্যমিকে ৮৯ শতাংশ ও উচ্চ-মাধ্যমিকে ৮৭ শতাংশ নম্বর পাওয়া নিলয় রানিং ইয়ারে, মানে গতবছরের নিট পরীক্ষায় পেয়েছিল ২৭৩ নম্বর। র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ষোলো লাখ তিয়াত্তর হাজারের মতো। সেই র‍্যাঙ্ক থেকে আল-আমীন মিশনে মাত্র এক বছর কোচিং নেওয়ার পরে এ-বছর নিলয়ের র‍্যাঙ্ক হয়েছে ৩০৭৪। এই র‍্যাঙ্কের ভিত্তিতে সে রাজ্যের অন্যতম সেরা মেডিকেল ইনসটিটিউট কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছে।

নিলয়ের মতো ছাত্র-ছাত্রীদের হাত ধরে যেমন তাদের এলাকার একটা সুনাম অর্জিত হচ্ছে, তেমন বৃহত্তর সংখ্যালঘু সমাজ সম্পর্কে মানুষের ধারণা ইতিবাচক অর্থে বদলে যাচ্ছে। ■

আইনাল কবির

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৩৪২৪

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

স্বপ্ন, অধ্যবসায় আর আত্মবিশ্বাস— এই তিনটে গুণ একজন মানুষের জীবনকে বদলে দিতে পারে— আমরা কথা বলছি এমন একজন ছাত্রকে নিয়ে। নাম আইনাল কবির। মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানার ডোমকল গ্রামে বাড়ি। একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। পিতা মহম্মদ মিযানুল হক ও মা সহিদা বানু— দু-জনেই ইতিহাসে এম.এ. পাস। এবং দু-জনেই প্যারাটিচার হিসেবে স্বল্প বেতনের চাকরি করেন। তাঁদের স্বপ্ন পরিবারের একমাত্র সন্তানকে পড়াশোনা শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করা। তাঁদের সন্তান আইনাল মেধাবী ছাত্র। ২০২২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উজ্জ্বল ফল করে সবার নজর কেড়েছিল। পেয়েছিল ৯৫.৭ শতাংশ নম্বর। আইনাল মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে তাদের গ্রামের মডেল স্কুল নামে একটি স্কুলে। তারপর একাদশ শ্রেণি থেকে পড়ছে আল-আমীন মিশনে। পড়ত খলতপুর শাখায়। ২০২৪ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে পায় ৯২.৬ শতাংশ নম্বর। গতবছর সে নিট পরীক্ষায় পেয়েছিল ৬১৫ নম্বর। র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ৬০ হাজারের মতো। এম.বি.বি.এস. ভর্তি হওয়ার স্বপ্ন পূরণ না হলেও হতাশ হয়ে থেমে থাকেনি। কারণ, নিট পরীক্ষা বিষয়ে যাঁরা খোঁজখবর রাখেন তাঁরা জানেন, যে-ছাত্র রানিং ইয়ারে ৬১৫ নম্বর পায়, তার জন্যে সফল হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। এ-বছর, অর্থাৎ ২০২৫ সালের নিট পরীক্ষায় ৫৮১ নম্বর পেয়ে এবং সর্বভারতীয় স্তরে ৩৪২৪ র‍্যাঙ্ক করে আইনাল সেই কথাকেই সত্য বলে প্রমাণ করেছে।

নিট পরীক্ষায় সাফল্য লাভের ক্ষেত্রে আইনাল মনে করে সেল্ফ স্টাডি, নিয়মিত নোট তৈরি, ইন্টারনাল মকটেস্ট দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এই পথে হেঁটেই নিজের প্রস্তুতিকে ধারালো করে তুলেছে সে। এইভাবেই পৌঁছে গেছে সাফল্যের দোরগোড়ায়।

নিট পরীক্ষায় সাফল্য লাভের ক্ষেত্রে আইনাল মনে করে সেল্ফ স্টাডি, নিয়মিত নোট তৈরি, ইন্টারনাল মকটেস্ট দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এই পথে হেঁটেই নিজের প্রস্তুতিকে ধারালো করে তুলেছে সে। এইভাবেই পৌঁছে গেছে সাফল্যের দোরগোড়ায়।

পড়াশোনার পাশাপাশি অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে সে এ পি জে আবদুল কালাম, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো ব্যক্তিত্বদের কথা উল্লেখ করে। বিজ্ঞান, বিশেষ করে পদার্থবিদ্যা তাঁর প্রিয় বিষয়। আর খেলাধুলার মধ্যে ক্রিকেট তাকে দেয় নতুন উদ্যম। ভবিষ্যতে স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ হতে চায় আইনাল। তার মতো মেধাবী ও পরিশ্রমী ছাত্ররা আগামী ভারতের সত্যিকারের সম্পদ, যারা নিজের যোগ্যতা আর নিষ্ঠার মাধ্যমে একদিন দেশের গর্ব হয়ে উঠবে। ■

রিজওয়ানুল আরেফিন

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৩৯০৩

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

স্বপ্ন দেখার সাহস যাদের আছে, তারাই একদিন জীবনের বাস্তব মঞ্চে সাফল্য অর্জন করে। রিজওয়ানুল আরেফিন তারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার বাইদপুর গ্রামের এই ছাত্র প্রমাণ করেছে যে, সীমিত সুযোগ-সুবিধা থেকেও দৃঢ় ইচ্ছেশক্তি ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বড়ো লক্ষ্য পূরণ করা যায়। রিজওয়ানুলের পিতা সামসুল আরেফিনের পড়াশোনা উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত। তিনি আল-আমীন মিশনেই চাকরি করেন। তার মা রুনা লাইলাও উচ্চ-মাধ্যমিক পাস। তিনি গৃহবধূ। এই পরিবারের একমাত্র সন্তান ডাক্তারি পড়ার ছাড়পত্র পেয়ে গেল।

রিজওয়ানুল আল-আমীন মিশনে পড়াশোনা করেছে ক্লাস ফাইভ থেকে। পড়ত উজুনিয়া শাখায়। ২০২২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে সে। পায় ৯২.৪ শতাংশ নম্বর। এর পরে উচ্চ-মাধ্যমিক ও নিট কোচিং নিয়েছে খলতপুর শাখা থেকে। ২০২৪ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৫.২ শতাংশ নম্বর পেয়ে নিজের মেধার পরিচয় আবার সবার সামনে তুলে ধরে। শুধু তা-ই নয়, রানিং ইয়ারে তার নিট (ইউজি) পরীক্ষার ফলও সকলের নজর কাড়ে। পেয়েছিল ৬২৯ নম্বর, সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ৪৬১৪৫। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার তীরে এসে তরী ডুবে যায়, অল্প কয়েক নম্বরের জন্যে এম.বি.বি.এস. পড়ার স্বপ্ন অধরা থেকে যায়। হতাশ না হয়ে সে আবার পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করে। নিয়মিত পড়াশোনা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও একাগ্র চেষ্টার ফলে এ-বছরের নিট পরীক্ষায় ৫৭৮ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় স্তরে তার র‍্যাঙ্ক হয়েছে ৩৯০৩।

> **মাসিক আয় সীমিত হলেও, রিজওয়ানুলের পিতা-মাতা সবসময়ই ছেলের শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও নিঃস্বার্থ সমর্থন রিজওয়ানুলের স্বপ্নপূরণের শক্ত ভিত্তি গড়ে দিয়েছে।**

পরিবারের মাসিক আয় সীমিত হলেও, রিজওয়ানুলের পিতা-মাতা সবসময়ই ছেলের শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও নিঃস্বার্থ সমর্থন রিজওয়ানুলের স্বপ্নপূরণের শক্ত ভিত্তি গড়ে দিয়েছে।

পড়াশোনার ক্ষেত্রে রিজওয়ানুলের প্রিয় বিষয় জীববিদ্যা। তার পড়াশোনার কৌশল হল— সেল্ফ স্টাডি, সময়ের ঠিক ব্যবহার। সে বিশ্বাস করে, সাফল্যের কোনো শর্টকার্ট নেই, বরং অধ্যবসায়, শৃঙ্খলা ও কঠোর পরিশ্রমই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। নিট পরীক্ষার্থীদের প্রতি তার পরামর্শ হল, "নিয়মিত পড়ে যাও। প্রতিটি বিষয় ও টপিককে সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে।" শুধু পড়াশোনা নয়, খেলাধুলাতেও তার আগ্রহ প্রবল। ক্রিকেট তার প্রিয় খেলা। রিজওয়ানুল ভবিষ্যতে একজন কার্ডিয়োলজিস্ট সার্জন হতে চায়। রিজওয়ানুলের মতো মেধাবী ছাত্র স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়ে অসংখ্য মানুষের জীবন আলোকিত করবে— এটাই সবার প্রত্যাশা। ■

আবদুল রাজেব সেখ

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৪২৯২

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

স্বপ্ন, অধ্যবসায় আর সংগ্রামের মেলবন্ধন একজন অতি সাধারণ পরিবারের সন্তানকেও যে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেয়, তার উদাহরণ আমরা কেবল সংবাদমাধ্যমেই দেখতে পাই না, কখনো কখনো আমাদের আশপাশেও এমন নজির তৈরি হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগর থানার আন্দুলবেড়িয়া গ্রামের ছেলে আবদুল রাজেব সেখ সেরকমই এক উজ্জ্বল উদাহরণ। একেবারে সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা রাজেব নিজের মেধা, কঠোর পরিশ্রম এবং আত্মবিশ্বাসের জোরে এমন এক অর্জনের পথে হাঁটছে, যা কেবল তার পরিবার নয়, পুরো সমাজের জন্যে গর্বের।

রাজেবের বাবা মকবুল হোসেনের পড়াশোনা ক্লাস এইট পর্যন্ত। তিনি একজন সাধারণ কৃষিজীবী। মা রুমিজা বিবি মাধ্যমিক পাস। তিনি গৃহিণী। রাজেব সেখের দুই দিদি আর এক বোন আছে। উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ার পরে দুই দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। ছোটোবোন ক্লাস নাইনে পড়ছে। সংসারের সীমিত আয়, গ্রামে পড়াশোনার প্রতিকূল পরিবেশ— কোনো কিছুই রাজেবকে থামাতে পারেনি। বরং এই সীমাবদ্ধতাই তার স্বপ্নকে আরও দৃঢ় করেছে।

পড়াশোনার প্রতি তার অদম্য ভালোবাসা শৈশব থেকেই স্পষ্ট। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ক্লাস সিক্সে আল-আমীন মিশনের বীরপুর শাখায় ভর্তি হয় রাজেব। ২০২২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৩.৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে সে প্রথম বার প্রমাণ করেছিল যে, কঠোর পরিশ্রম করলে গ্রামীণ ছাত্ররাও অসাধারণ ফল করতে পারে। এর পরে ২০২৪ সালে উচ্চ-মাধ্যমিকে অর্জন করে ৯৫.৬ শতাংশ নম্বর, যা তার ধারাবাহিক সাফল্যের উজ্জ্বল প্রমাণ।

কেবল স্কুল স্তরের পরীক্ষায় নয়, জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতেও রাজেব রেখেছে নিজের মেধার স্বাক্ষর। রানিং ইয়ারে, অর্থাৎ ২০২৪ সালে সে নিট (ইউজি) পরীক্ষায় পেয়েছিল ৫৮২ নম্বর। এম.বি.বি.এস. পড়ার স্বপ্ন অধরা থেকে যায়। নয়াবাজ শাখাতেই আরও এক বছর নিট কোচিং নেয়। এক বছরের নিরলস পরিশ্রম ফল দিয়েছে এ-বছর। ২০২৫ সালে নিট (ইউজি) পরীক্ষায় সে ৫৭৫ নম্বর পেয়েছে এবং সর্বভারতীয় স্তরে তার র‍্যাঙ্ক দাঁড়িয়েছে ৪২৯২। এ-অর্জন যেকোনো পড়ুয়ার জন্যেই অসাধারণ, বিশেষ করে আবদুল রাজেব সেখের পরিবারের মতো পরিবারের ছেলে-মেয়েদের কাছে।

রাজেবের প্রিয় বিষয় অঙ্ক। আর স্বপ্ন ডাক্তার হওয়া। সে বিশ্বাস করে, চিকিৎসকের পেশা কেবল জীবিকা নয়— এটি হল মানুষের সেবার সর্বোত্তম পথ। তাঁর লক্ষ্য একজন দক্ষ চিকিৎসক হয়ে গ্রামীণ মানুষদের সেবা করা, যাতে গ্রামের সাধারণ মানুষও উন্নত চিকিৎসার সুযোগ পান।

রাজেব মনে করে, বড়ো স্বপ্ন দেখতে হবে, আর সেই স্বপ্নকে পূরণ করতে হলে চাই শৃঙ্খলা, নিয়মিত পড়াশোনা আর অটল আত্মবিশ্বাস। নিটের প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে তার পরামর্শ— "ছাত্র-ছাত্রীদের সবচেয়ে বড়ো সাথি হল বই। সেইসঙ্গে সময়কে মূল্য দিতে হবে। প্রতিটি টপিকের কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে ডিসেম্বরের মধ্যে অন্তত একবার রিভাইজ করে নিতে হবে। তারপর যত বেশি মকটেস্ট দেওয়া যায় সেই চেষ্টা জারি রাখতে হবে। এ-বছরের প্রশ্নের ধরন থেকে শিক্ষা নিয়ে অঙ্কের ওপর জোর দিতে হবে।" আবদুল রাজেব সেখের সাফল্য আজ অনেক পড়ুয়ার কাছে এক অনুপ্রেরণা। ■

লুবনা ফারহাদ মণ্ডল

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৪৩৫০

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

মানুষের জীবনে স্বপ্নই হল অগ্রগতির আসল প্রেরণা। সেই স্বপ্নকে ধারণ করেই এগিয়ে চলেছে লুবনা ফারহাদ মণ্ডল। গ্রামের সাধারণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা এই মেধাবী শিক্ষার্থী কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি গভীর আস্থাকে ভিত্তি করে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

নদীয়া জেলার পলাশিপাড়া থানার অন্তর্গত পলষণ্ডা গ্রামেই তার শৈশব ও শিক্ষাজীবনের শুরু। তারপর ক্লাস ফাইভ থেকে সে আল-আমীন মিশনে পড়াশোনা করেছে। আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখায় পড়াশোনা করেছে উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত। ২০২০ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৬.২ শতাংশ। উচ্চ-মাধ্যমিকে সে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে ৯৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে। এরপর তিন বছর সে ব্যয় করে এম.বি.বি.এস. পড়ার স্বপ্নকে সাকার করতে। গতবছর ৬৩৩ নম্বর পেয়েও মাত্র কয়েক নম্বরের জন্যে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। লেগে থাকো— এই মন্ত্রকে সম্বল করেই লড়াই জারি রেখেছিল। সেই লড়াইয়ের ফল ২০২৫ সালের নিট পরীক্ষায় ৪৩৫০ র‍্যাঙ্ক। ৫৭৫ নম্বর পেয়ে এই র‍্যাঙ্ক করেছে লুবনা ফারহাদ।

তার পরিবার তার শক্তির প্রধান ভিত্তি। স্নাতক পিতা আব্দুর রাকিব মণ্ডল একজন ব্যবসায়ী। উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছেন লুবনার মা সাকিনা বানু মণ্ডল। তিনি একজন গৃহিণী। পিতামাতা ধৈর্য, ভালোবাসা ও মূল্যবোধ দিয়ে সন্তানদের গড়ে তুলছেন। লুবনা ফারহাদের দিদি এবতেসাম ফারহাদও আল-আমীন মিশনের প্রাক্তনী। তিনি বর্তমানে এম.বি.বি.এস. পড়ছেন। তাদের ছোটোবোন নৌরিন ফিজা মিশনের খলতপুর শাখার নবম শ্রেণির ছাত্রী। একই পরিবারের তিন সন্তানের মধ্যে দু-জন ডাক্তার হতে চলেছে, তৃতীয় জনও যে সম্মানজনক পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করবে, তা একরকম বলাই যায়।

> **ভবিষ্যতে রেডিয়োলজিস্ট হতে চাওয়া লুবনা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে ‘পরিশ্রম, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি’ জীবনের যেকোনো বাধা অতিক্রম করার মূল চাবিকাঠি।**
>
> “

ভবিষ্যতে রেডিয়োলজিস্ট হতে চাওয়া লুবনা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে ‘পরিশ্রম, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি’ জীবনের যেকোনো বাধা অতিক্রম করার মূল চাবিকাঠি। তার প্রিয় বিষয় পদার্থবিদ্যা। অবসর সময়ে গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে। খেলাধুলার মধ্যে ব্যাডমিন্টন তার অন্যতম প্রিয় খেলা। লুবনা শিক্ষকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। তার মতে, শিক্ষার প্রকৃত পরিবেশ তখনই তৈরি হয়, যখন শিক্ষকরা আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ান। এ-জন্যে সে আল-আমীন মিশনের শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞ, কারণ তাঁদের সহযোগিতা ও গাইডেন্স ছাড়া তার স্বপ্নপূরণ সম্ভব হত না। ■

রনি মণ্ডল

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৪৮৯৫

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

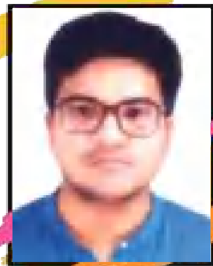

রনি মণ্ডলের বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার রামনগর গ্রামে। পিতা রাজা মণ্ডল মাধ্যমিক পাস। তিনি হকারি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। একজন শ্রমজীবী মানুষ। তার মা মুর্শিদা বিবিও পড়েছেন মাধ্যমিক পর্যন্ত। তিনি একজন গৃহিণী। রনির বোন রিমিয়া মণ্ডল একটি হাই মাদ্রাসায় দশম শ্রেণির ছাত্রী। রনির পারিবারিক চিত্র থেকে স্পষ্ট সে একজন নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান। কিন্তু রনির বাবা-মা ও তার স্বপ্ন ছোটো নয়। ছোটো থেকেই রনির লক্ষ্য ছিল একদিন ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করবে। জীবনের পথে অসংখ্য বাধা এলেও রনি কখনো সেই বাধাগুলোকে ভয় পায়নি, প্রেরণা হিসেবে নিয়েছে।

২০১৯ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে ৭০ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয় এবং ২০২১ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭৫ শতাংশ নম্বর অর্জন করে। অনেকে মনে করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকে দুর্দান্ত রেজাল্ট-করা ছাত্র-ছাত্রীরাই ডাক্তার হওয়ার যোগ্য। তাদের সামনে রনি একটি উদাহরণ। মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল না হলেও হতাশ হওয়ার কিছু নেই। নিট পরীক্ষায় পাস করলেই ডাক্তারি পড়ার ছাড়পত্র পাওয়া যায়। আল-আমীন মিশনের মতো প্রতিষ্ঠানের ফলপ্রসূ গাইডেন্স মেনে, যদি পেছনের কথা ভুলে কেউ জানপ্রাণ লড়িয়ে দিয়ে নিটের জন্যে পরিশ্রম করে তাহলে ডাক্তারি পড়ার স্বপ্ন সফল করাই শুধু নয়, অত্যন্ত ভালো র‍্যাঙ্ক করে তাক লাগিয়ে দেওয়াও সম্ভব। রনির সাফল্যই তার প্রমাণ। সে ২০২৫ সালের নিট পরীক্ষায় ৫৭২ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় স্তরে ২৪১৯ র‍্যাঙ্ক করেছে। রনি মিশনে কেবল নিটের কোচিং নিতেই ভর্তি হয়েছিল। সে কোচিং নিয়েছে বজবজ শাখায়।

> **রনির অনুপ্রেরণা ছিল তার চারপাশের মানুষ এবং পরিবারের প্রত্যাশা। তার শিক্ষাজীবনের পথচলায় অনেক সময় আর্থিক সংকট এসেছে, অনেক সময় পড়াশোনার চাপ থেকেছে, কিন্তু সে কখনো পিছিয়ে যায়নি।**

রনির অনুপ্রেরণা ছিল তার চারপাশের মানুষ এবং পরিবারের প্রত্যাশা। তার শিক্ষাজীবনের পথচলায় অনেক সময় আর্থিক সংকট এসেছে, অনেক সময় পড়াশোনার চাপ থেকেছে, কিন্তু সে কখনো পিছিয়ে যায়নি। তার কাছে সফলতার মানে হল অধ্যবসায়, দৃঢ়তা এবং অবিচল মনোযোগ। নিট পরীক্ষায় সফল হওয়ার ক্ষেত্রে তার পরামর্শ, "পড়াশোনায় গভীর মনোযোগ থাকতে হবে। প্রতিটা অধ্যায় সম্পর্কে পরিষ্কার কনসেপ্ট থাকা জরুরি। এনসিইআরটি-র বই পড়া আর যত পারা যায় মকটেস্ট দেওয়া।"

ড. এ পি জে আবদুল কালামের মতোই রনির বিশ্বাস, বড়ো স্বপ্ন দেখতে হয়, তারপর সেই স্বপ্ন পূরণের জন্যে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। তার সাফল্যের কৃতিত্ব সে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌কে উৎসর্গ করেছে, কারণ, তার বিশ্বাস— আল্লাহ্‌র ইচ্ছে ছাড়া কোনোকিছুই সম্ভব নয়। ■

সাহারুল সেখ

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৫৫৩৮

আই পি জি এম ই আর অ্যান্ড এস এস কে এম হসপিটাল

প্রতিটি মানুষের জীবনের গল্প আলাদা, কিন্তু কিছু গল্প আমাদের ভেতরে এক বিশেষ অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলে। সাহারুল সেখের গল্পটাও তেমনই এক গল্প— সংগ্রাম, স্বপ্ন আর অদম্য ইচ্ছেশক্তির গল্প।

মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানার বেনাদহ গ্রামের একটি সাধারণ কৃষকপরিবারে জন্ম সাহারুল সেখের। পিতা জারমান সেখ কোনো পড়াশোনা জানেন না। এমন মানুষদের গতরের ওপরেই ভরসা। কৃষিকাজের শ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। মা সাহানারা বিবি পড়েছেন ক্লাস ফোর পর্যন্ত। তিনি একজন গৃহিণী। সাহারুলের এক ভাই আছে— তাসিকুর সেখ। সে দশম শ্রেণির ছাত্র। সংসারের আয় সীমিত হলেও সাহারুলের পিতা-মাতা ছেলেদের পড়াশোনা শিখিয়ে মানুষ করার স্বপ্ন দেখতে ভোলেননি। সাহারুলের চোখেও সবসময় ছিল বড়ো কিছু করার ইচ্ছে। পিতার মাসিক আয় হয়তো মাত্র কয়েক হাজার টাকা, কিন্তু, তাঁদের সম্মিলিত স্বপ্নের মূল্য কখনো টাকার অঙ্কে ধরা যায় না।

সাহারুল আল-আমীনে পড়েছে একাদশ শ্রেণি থেকে। সে পড়ত মুর্শিদাবাদের লালবাগ শাখায়। সে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছে দেবকুণ্ডা হাই মাদ্রাসায়। ২০২২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়ে নিজেকে মেধাবী পড়ুয়া হিসেবে পরিচিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এরপর আল-আমীন মিশনের তত্ত্বাবধানে দু-বছর পড়ার পরে ২০২৪

> **সাহারুল মিশনের দেওয়া সুযোগকে কাজে লাগাতে জানপ্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করেছে। ২০২৫ সালের নিট (ইউজি) পরীক্ষায় তার র‍্যাঙ্ক হয়েছে ৫৫৩৮। প্রাপ্ত নম্বর ৫৭০।**
>
> ❝

সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পায় ৮৯ শতাংশ নম্বর। রানিং ইয়ারে নিট পরীক্ষায় বসে পেয়েছিল ৫৯৯ নম্বর। তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল কৃষকপরিবারের সন্তানের ডাক্তার হওয়ার বিষয়টা। আল-আমীন মিশন সম্ভাবনাময় ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা দিয়ে সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে বরাবর। এ-ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। সাহারুলকে মিশনের প্রধান শাখা খলতপুরে পড়ার সুযোগ দেয়। তাও খুবই অল্প বেতনের বিনিময়ে। বলতে গেলে পাঁচ ভাগের এক ভাগ বেতন দিয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছে সাহারুল। মিশনের দেওয়া সুযোগকে কাজে লাগাতে জানপ্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করেছে সে। ফলও পেয়েছে। ২০২৫ সালের নিট (ইউজি) পরীক্ষায় তার সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক হয়েছে ৫৫৩৮। প্রাপ্ত নম্বর ৫৭০। কেবল এনসিইআরটি-র বইপত্র পড়ার ওপরেই জোর দিয়ে এই সাফল্য পেয়েছে সে।

সাহারুলের কাছে জীবন মানে শুধু পড়াশোনায় সাফল্য পাওয়া নয়, বরং নিজের পরিবারকে আরও ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়া। সে বিশ্বাস করে, “শিক্ষাই পারে মানুষকে বদলে দিতে এবং নিজের মতো করে সমাজে পরিচিতি তৈরি করাতে।” তার লক্ষ্য নিজের পরিবারের উন্নতির পাশাপাশি নিজের গ্রাম ও সমাজের উন্নতিতে ভূমিকা রাখা। ■

রহিমা খাতুন

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৬৭৮৯

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

রহিমা খাতুন, মুর্শিদাবাদের এক সাধারণ গ্রামীণ পরিবারে জন্ম নেওয়া মেয়ে। তার বাড়ি সালার থানার গুলহাটিয়া গ্রামে। ছোটোবেলা থেকেই তার স্বপ্ন ছিল পড়াশোনা করে সমাজে নিজের পরিচয় তৈরি করা। তার পরিবার আর্থিকভাবে খুব বেশি সমৃদ্ধ না হলেও সে কখনোই হাল ছাড়েনি। বরং তাদের পরিবারে শিক্ষার প্রতি ভালোবাসা লক্ষ করে অনুভব করেছে শিক্ষাকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার হাতিয়ার করতে হবে। তার আব্বা মহম্মদ রজব আলি এম.এ. পাস। গৃহশিক্ষকতা করেন। মা মেহেরনিকা বিবি পড়েছেন উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত। তিনি গৃহবধূ। বাবা একজন টিউটর এবং মা একজন গৃহিণী। রহিমার দিদি আসমাতারা খাতুন পড়েছেন এম.এ. পর্যন্ত। টিউশনের সীমিত উপার্জনে সংসার চালাতে অসুবিধার মুখে পড়তে হলেও বাবা-মা সবসময় মেয়েদের পড়াশোনার প্রতি উৎসাহ দিয়ে গেছেন। আল-আমীন মিশনও খুবই কম বেতনে রহিমাকে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

রহিমা আল-আমীন মিশনে পড়েছে ক্লাস এইট থেকে। সে পড়ত আল-আমীন মিশন পরিচালিত জ্ঞান সঞ্চয় একাডেমিতে। অধ্যবসায় আর কঠোর পরিশ্রমের ফলে রহিমা প্রতিটি পরীক্ষায় উজ্জ্বল সাফল্য অর্জন করেছে। ২০২০ সালে মাধ্যমিক ও ২০২২ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক, দুটো পরীক্ষাতেই ৯৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। এরপর শুরু হয় রহিমার ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন সফল করার লড়াই। সেই লড়াইয়ে সফল হতে তিন বছর সময় লাগলেও হতাশা তাকে গ্রাস করতে পারেনি। দু-বছরের মাথায়, গতবছর সে নিট পরীক্ষায় পেয়েছিল ৬২৪ নম্বর। মাত্র কয়েক নম্বরের জন্যে এম.বি.বি.এস. পড়ার স্বপ্ন অধরা থেকে যাওয়ায় ভেঙে পড়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু, বিজয়ীরা হেরে যেতে যেতেও জিতে যায় কেবল লড়াইয়ের ময়দানে টিকে থাকার কারণে। লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে দিলে জেতার আশা চিরতরে মুছে যায়। রহিমা তাই দাঁতে দাঁত চেপে আবারও প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। এ-বার, ২০২৫ সালের নিট পরীক্ষার সাফল্য সেই লড়াইয়ের ফল। সে এ-বার ৫৬৫ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় স্তরে ৬৭৮৯ র‍্যাঙ্ক করেছে।

তার স্বপ্ন গাইনোকোলজিস্ট হওয়া। গুলহাটিয়া গ্রামে এই প্রথম বার কোনো মেয়ে ডাক্তার হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। রহিমা বলে, “ইনশা আল্লাহ্, আমি আমার গ্রামে প্রথম ডাক্তার হব।” তার এই বিশ্বাস শুধু নিজের স্বপ্ন নয়, বরং গ্রামের অসংখ্য মেয়েদের জন্যেও এক অনুপ্রেরণা।

সে মনে করে নিট পরীক্ষায় সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হল— ডেডিকেশন, হার্ড ওয়ার্ক, নিজের ওপর বিশ্বাস এবং ধৈর্য। পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিত মকটেস্ট দিয়ে নিজের প্রস্তুতিকে আরও দৃঢ় করেছে রহিমা। সে বই পড়তে ভালোবাসে। তার প্রিয় বিষয় কেমিস্ট্রি। আর অনুপ্রেরণাদায়ী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে রয়েছেন ড. এ পি জে আবদুল কালাম এবং দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঙ্গুলী। এঁদের জীবনকাহিনি তাকে সাহস জোগায় এবং স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

আজ রহিমা মনে করে সে খুবই ভাগ্যবতী, কারণ, আল্লাহ্ তাকে আল-আমীন মিশনে পড়াশোনার সুযোগ করে দিয়েছেন। সে কৃতজ্ঞ মিশনের শিক্ষকদের প্রতি এবং সেইসমস্ত মানুষদের প্রতিও, যাঁরা তাকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছেন। ■

মহম্মদ ইনতিয়াজ হক

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৮১৪৮

এন আর এস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার রামপুরহাট গ্রামের মাটিতে বেড়ে ওঠা ছেলেটির নাম মহম্মদ ইনতিয়াজ হক। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। পিতা মহম্মদ সাজ্জাদ আহমেদ বি.এ. পাস। সরকারি চাকুরিজীবী। মা নিলুফা ইয়াসমিন পড়েছেন উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত। তিনি গৃহিণী। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান ইনতিয়াজ। সে আল-আমীন মিশনে পড়েছে ক্লাস ইলেভেন থেকে। পড়ত খলতপুর শাখায়। নিট কোচিংও নিয়েছে খলতপুর শাখায়। তবে তার আগে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছে অন্য এক আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। ছোটোবেলা থেকেই সে এলাকায় মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত। মাধ্যমিক থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক, নিট (ইউজি)— প্রতিটি ধাপেই সে নিজের মেধা আর অধ্যবসায়ের ছাপ রেখেছে। ২০২২ সালে মাধ্যমিকে ৯৩ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে উচ্চ-মাধ্যমিকে ৯৪.২ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। বর্তমানে রানিং ইয়ারেই মেধাবী ছেলে-মেয়েরা যাতে নিট পাস করতে পারে আল-আমীন মিশন তার ওপর জোর দিচ্ছে। তাতে ভালো ফলও পাওয়া যাচ্ছে। অনেকে সফল হচ্ছে। যারা হচ্ছে না তারা পরের বছর সফলতা পাচ্ছে। ইনতিয়াজের ক্ষেত্রেও আমরা সেই ছবি দেখতে পাচ্ছি। সে গতবছর রানিঙে পেয়েছিল ৫৪৩ নম্বর। এই ফল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিয়েছিল। এক বছর পরে সেই ভাবনাই সত্যি হল। ইনতিয়াজ ৫৬১ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় স্তরে এ-বছর র‍্যাঙ্ক করেছে ৮১৪৮। এটা তার দৃঢ় মনোবল আর কঠোর পরিশ্রমের ফল। ভবিষ্যতে সে কার্ডিয়োলজিস্ট হতে চায়। নিটে সফল হওয়ার ক্ষেত্রে তার পরামর্শ হল— "সেল্ফ স্টাডি করা আর মোটিভেটেড থাকা।" ইনতিয়াজের প্রিয় বিষয় হল ইংরেজি। প্রিয় বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখাপড়ার বাইরে সে দাবা খেলতে পছন্দ করে। দাবা খেলতে যেমন প্রতিভা আর দক্ষতা লাগে তেমনি ইনতিয়াজ মনে করে জীবনে কোনো স্বপ্ন পূরণ করতে গেলে শুধু প্রতিভা নয়, দরকার অধ্যবসায় আর ঠিক দিক্‌নির্দেশনা। আল-আমীন মিশনের ঠিক দিক্‌নির্দেশনা তার সাফল্য লাভের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করে সে। ■

ইনতিয়াজ ৫৬১ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় স্তরে এ-বছর র‍্যাঙ্ক করেছে ৮১৪৮। জীবনে কোনো স্বপ্ন পূরণ করতে গেলে শুধু প্রতিভা নয়, দরকার অধ্যবসায় আর ঠিক দিক্‌নির্দেশনা। আল-আমীন মিশনের দিক্‌নির্দেশনা তার সাফল্য লাভের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করে সে।

মহম্মদ সারওয়ার একবাল

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৮৪৩৮

এন আর এস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

গ্রামের সাধারণ এক কৃষকপরিবার থেকে উঠে আসা মেধাবী ছাত্র মহম্মদ সারওয়ার একবাল ডাক্তার হতে চলেছে— এটা আজ আর-কোনো ব্যতিক্রমী ঘটনা নয় আল-আমীন মিশনের কাছে। প্রতিবছর এমন বহু সারওয়ার ডাক্তারি পড়ার ছাড়পত্র হাতে নিয়ে পা রাখছে নতুন এক দুনিয়ায়, যেখানে নাম-যশ-খ্যাতি-প্রতিপত্তি অপেক্ষা করছে।

সারওয়ারের জন্ম ও বেড়ে ওঠা মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা থানার অন্তর্গত দেবপুর গ্রামে। কৃষক বাবা মহম্মদ কোরবান আলি মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। এবং গৃহিণী মা মোসাম্মৎ নাসরিন বানুর পড়াশোনাও মাধ্যমিক পর্যন্ত। বাড়িতে সারওয়ারের এক বোন আছে। নুরিন তামান্না। নাইনে পড়ে। নিজেদের বিঘে খানেক জমিই পরিবারের ভরসা। সীমিত উপার্জন করেও ছেলে-মেয়েদের পেছনে যতটা পারা যায় ব্যয় করেছেন সারওয়ার-নুরিনের বাবা-মা। সীমিত আর্থিক অবস্থার মধ্যেও বুকের মাঝে স্বপ্ন দেখার যে-সাহস লুকিয়ে রেখেছিলেন, সেই সাহসই তাঁদের সন্তানকে ডাক্তার হওয়ার দরজার সামনে হাজির করে দিয়েছে।

সারওয়ার ২০২২ সালে সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। তারপর উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনার জন্যে আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখায় ভর্তি হয়। ২০২৪ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে পায় ৯০.৮ শতাংশ নম্বর। গতবছর একইসঙ্গে নিট পরীক্ষায় বসে পেয়েছিল ৫৪৯ নম্বর। খলতপুর শাখাতেই আরও এক বছর নিট কোচিং নেওয়ার পরে এ-বছর সে পেয়েছে ৫৬০ নম্বর। তার সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক হয়েছে ৮৪৩৮।

২০২৪ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে পায় ৯০.৮ শতাংশ নম্বর। গতবছর নিটে পেয়েছিল ৫৪৯ নম্বর। খলতপুর শাখাতেই আরও এক বছর নিট কোচিং নেওয়ার পরে এ-বছর সে পেয়েছে ৫৬০ নম্বর। তার সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক হয়েছে ৮৪৩৮।

ছোটোবেলা থেকেই সারওয়ার জানত যে, জীবনে কিছু করতে হলে দরকার কঠোর পরিশ্রম, নিয়মশৃঙ্খলা এবং অধ্যবসায়। তাই মন দিয়ে পড়াশোনা করেছে। তার সবচেয়ে প্রিয় বিষয় হল গণিত। তার প্রিয় খেলা ফুটবল হলেও প্রিয় খেলোয়াড় এম এস ধোনি। প্রিয় সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভবিষ্যতে সে নিউরোলজি বিষয়ে উচ্চতর পড়াশোনা করার ইচ্ছে পোষণ করে। নিট-পরীক্ষার্থীদের জন্যে তার পরামর্শ হল— “সফল হতে চাইলে নিয়মানুবর্তী ও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পড়াশোনা করা খুবই দরকার।” ■

মহম্মদ মেহেবুব মুর্শিদ

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৯১৭২

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

২০২০ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় মহম্মদ মেহেবুব মুর্শিদ যে-স্কুলে পড়ত, সেই স্কুলে তার মোট সহপাঠীর সংখ্যা ছিল ৪৯ জন। বর্তমানে এরা অধিকাংশই বিভিন্ন সাধারণ পেশায় নিয়োজিত এবং কয়েক জন মাত্র উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছে। আরও একটা বিশেষ তথ্য হল সকল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র এক জনই সরকারি মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস. পড়ার ছাড়পত্র পেয়েছে। সেই সফল ছাত্রই মহম্মদ মেহেবুব মুর্শিদ।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানার নওগাঁ গ্রামের সন্তান মেহেবুব। তার আব্বা মানিক আলি কৃষিজীবী মানুষ। নিজেদের বিঘা খানেক জমির চাষাবাদেই সংসার নির্বাহ করে থাকেন। পড়াশোনা করেছেন অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। মেহেবুবের মা তোফিজা খাতুন বিবি গৃহবধূ। তাঁর পড়াশোনা দশম শ্রেণি পর্যন্ত। মেহেবুবের একমাত্র ভাই খায়রুল স্নাতক স্তরের প্রথম বর্ষের ছাত্র। পাশাপাশি তারানগর হিফজুল কুরআন মাদ্রাসায় হিফজও করছে। মেহেবুবের সম্পর্কিত নানা মহম্মদ ইব্রাহিম মিঞা বেলপুকুর আল-আমীন মিশনে শিক্ষকতা করেন। তার মাধ্যমে সে মিশনের নাম শুনেছে এবং পরবর্তী সময়ে মিশনে ভর্তি হয়। মেহেবুবের পড়াশোনার শুরু শুকদেবপুর এফ পি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পঞ্চম শ্রেণিতে নওগাঁ হাই স্কুলে ভর্তি হয় সে। ২০২০ সালে ওই স্কুল থেকেই ৮৮.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এর পরে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে মিশনের বেলপুকুর শাখায় একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়। ২০২২-এ ৯১.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা সাফল্যের সঙ্গে পাস করে।

মেহেবুব জানায়, “আল-আমীনে আসার পরই সিনিয়র দাদাদের কাছে শুনে শুনে ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে জন্মায়। এর সঙ্গে আব্বা-মায়ের ইচ্ছে জুড়ে যায়। সেই স্বপ্নকে সফল করতে উচ্চ-মাধ্যমিকের বছরই নিটে বসতে মনস্থির করি। ৩২৮ নম্বর পেয়ে উজ্জীবিত হই। যদিও উপলব্ধি করি নিট পরীক্ষায় সাফল্য পেতে হলে নিবিড় অনুশীলন জরুরি। এই উদ্দেশ্যেই খলতপুরে ভর্তি হই। ২০২৩ ও ২০২৪ সালের নিট পরীক্ষায় খলতপুর থেকেই যথাক্রমে ৫১৫ ও ৬০৭ নম্বর পেলেও সাফল্য আসেনি। এই প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি ২০২৫ সালে ইনশা আল্লাহ্ আমাকে সফল হতেই হবে। নিটে ৫৫৮ নম্বর পেয়ে এম.বি.বি.এস. পড়ার সুযোগ পেয়েছি।” আব্বা-মা এবং পাড়াপ্রতিবেশীদের শুভেচ্ছায় আপ্লুত হয়ে ওঠে মেহেবুব। যে-কথা বিশেষভাবে বলবার যে, তাদের নওগাঁ গ্রামের মধ্যে মেডিকেল কলেজের পড়ুয়া হিসেবে প্রথম সাফল্যের শিরোপা মেহেবুবের মাথায় উঠেছে।

মেহেবুবের ইচ্ছে এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি অর্জনের পরে নিউরোলজি নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা। সাধারণ মানুষের পাশে থেকে তাদের কিছুটা হলেও রোগভোগের যন্ত্রণা লাঘব করা। বিভিন্ন ধরনের, বিশেষ করে গল্পের বই পড়তে পছন্দ করে মেহেবুব। তার সাফল্যে মিশনের ভূমিকা বিষয়ে মেহেবুব মন্তব্য করে, “আমার এই সাফল্যের জন্যে আমি খুশি। এই সাফল্যের কারণে আমি আল-আমীন মিশনের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। বিশেষত, আমাদের প্রিয় সেক্রেটারি এম নুরুল ইসলাম স্যার এবং সেখ মারুফ আজম স্যারের কাছে। মিশন আমাদের পাশে না থাকলে এতদূর পথের সফল যাত্রা সম্ভব হত না।” ■

সেখ সাহানাজ

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১০১২৯

আর জি কর মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

জীবনের প্রতিটি বড়ো অর্জনের পেছনে থাকে পরিশ্রম, একাগ্রতা আর বিশ্বাস। ঠিক সেই পথেই হাঁটছে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির সন্তোষপুর গ্রামের মেয়ে সেখ সাহানাজ। তার বাবা মহম্মদ ইয়াসিন সেখ ও মা জিন্নাতুন্নেশা বেগম গ্র্যাজুয়েট। বাবা সরকারি কর্মচারী, মা গৃহবধূ। বাবা-মায়ের পরিশ্রম, ত্যাগ আর উৎসাহ সাহানাজের সাফল্যের মজবুত ভিত তৈরি করেছে। তার এক ভাইও পড়াশোনা করছে দ্বাদশ শ্রেণিতে। পরিবারের এই শিক্ষামুখী পরিবেশ পড়াশোনা করে কিছু করার মনোভাব গড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

সাহানাজ আল-আমীন মিশনে পড়েছে একাদশ শ্রেণি থেকে। পড়ত বর্ধমানের মেমারি শাখায়। তার আগে সে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছে স্থানীয় কারিয়া হাই স্কুলে। ২০২০ সালে সে মাধ্যমিকে ৯৪.৪ শতাংশ এবং ২০২২ সালে উচ্চ-মাধ্যমিকে ৯৬.৪ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। এরপর ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করার জন্যে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ তিন বছর সময় ব্যয় করতে হয়েছে। গতবছর মাত্র কয়েক নম্বরের জন্যে এম.বি.বি.এস. পড়ার স্বপ্ন ছুঁতে ব্যর্থ হয়। সে পেয়েছিল ৬২৯ নম্বর। মাত্র দু-পাঁচ নম্বরের জন্যে যখন বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন হাতছাড়া হয়ে যায় তখন হতাশায় ডুবে যাওয়ার কথা। কিন্তু, সাহানাজ হতাশায় ডুবে না গিয়ে আবার নতুন করে লড়াই শুরু করে। তার ফল সে পেয়েছে এ-বছর। নিট (ইউজি) পরীক্ষায় তার এ-বছরের র‍্যাঙ্ক হয়েছে ১০১২৯। মেয়েকে ডাক্তার করার যে-স্বপ্ন নিয়ে মিশনে ভর্তি করেছিলেন তার বাবা-মা, সেই স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছে সাহানাজ।

> **সাহানাজের সাফল্য কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় আর আল-আমীন মিশনের ঠিক দিক্‌নির্দেশাই এনে দিয়েছে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য।**

সাহানাজের সাফল্য কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় আর আল-আমীন মিশনের ঠিক দিক্‌নির্দেশাই এনে দিয়েছে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য। সে মনে করে সাফল্য লাভ করতে গেলে দরকার "কঠোর পরিশ্রম, ইতিবাচক মনোভাব আর আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রাখা।" কঠোর পরিশ্রম ছাড়া কোনো সাফল্যই সম্ভব নয়। ইতিবাচক মানসিকতা প্রতিটি ব্যর্থতাকে সাফল্যে রূপান্তরিত করে। বিশ্বাসের শক্তি মানুষকে সব বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করে।

ভবিষ্যতে রেডিয়োলজিস্ট হতে চাওয়া সাহানাজের প্রিয় বিষয় ফিজিক্স। প্রিয় ভারতীয় প্রখ্যাত চিকিৎসক দেবী শেঠি। সেখ সাহানাজের সাফল্যের গল্প আমাদের শেখায় যে, সুযোগের পাশাপাশি মনোবল, শৃঙ্খলা আর আত্মবিশ্বাস থাকলে সাফল্য নিশ্চিত। সাহানাজ কেবল ভালো ফল-করা একজন ছাত্রী নয়, বরং যারা স্বপ্ন দেখে সমাজকে আলোকিত করার কথা ভাবে তেমন হাজারো কিশোরীর কাছে এক রোল মডেল। আজকের দিনে যখন অনেকেই সামান্য বাধায় হাল ছেড়ে দেয়, সেখানে সাহানাজ প্রমাণ করেছে— যে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রাখে, কঠোর পরিশ্রম করে আর ইতিবাচক চিন্তা করে, তাকে কোনো বাধাই থামাতে পারে না। ■

মহম্মদ ওমেদুল্লা

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১১২০৩

আই পি জি এম ই আর অ্যান্ড এস এস কে এম হসপিটাল

"আমি সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষের জন্যে খুবই কম খরচে অতি সহজ পন্থায় নতুন চিকিৎসা করার পদ্ধতি খুঁজতে চাই। পাশাপাশি চিকিৎসাবিজ্ঞানকে নতুন কিছু উপহার দিতে চাই, যা গবেষণার মাধ্যমেই সম্ভব।"— এই স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছে ২০২৫-এর নিটে সফল মেডিকেলের ছাত্র মহম্মদ ওমেদুল্লা। ২০১১ সালে ওমেদুল্লা নার্সারি স্কুলে আপার কে জি ক্লাসের ছাত্র ছিল। সন্তানের লেখাপড়ায় পিতামাতার গুরুত্ব কত জরুরি সেসব কিছুই ওই বয়সে ওমেদুল্লার ভাবনায় থাকার কথা নয়। সে শুধু দেখেছে তার আব্বু খাটিয়ায় শুয়ে আছেন এবং মা কাঁদছেন। অন্যদেরও চোখ দিয়ে অনবরত অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। ২০১১ সালে তার আব্বা আজিজুল হক বাইকে করে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে ইন্তেকাল করেন। নবম শ্রেণি পর্যন্ত তিনি পড়েছেন। পেশায় ছিলেন বিড়ি কোম্পানির কর্মী।

চরম ভাগ্যবিপর্যয়ের এই পরিস্থিতিতে চার সন্তানের ভরণপোষণ, লেখাপড়া করিয়ে মানুষ করার দায়িত্ব পুরোটাই তখন নাসিমা বেগমের। তিনি বিড়ি বাঁধার কাজ করে সামান্য কিছু রোজগার করেন। পড়াশোনা মাধ্যমিক পর্যন্ত। ওমেদুল্লার নানা-নানিও মেয়ের দুর্দিনে পাশে দাঁড়ান। এরই মাঝে নার্সারি স্কুলের পড়ুয়া ওমেদুল্লা আল-আমীনে ভর্তির পরীক্ষায় পাস করে। পড়াশোনার খরচ নিয়ে চিন্তিত হয়েও আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে মিশনে পৌঁছোয় তারা। সেক্রেটারি স্যার মাসিক বেতন মাত্র দু-শো টাকায় মিশনের রহমানি একাডেমি ধুলিয়ানে ষষ্ঠ শ্রেণিতে তাকে ভর্তি করে নেন। ওমেদুল্লার মা অনেকটাই স্বস্তি পান। পরবর্তী সময়ে অবশ্য মাসিক বেতন সামান্য কিছু বেড়েছিল। ধুলিয়ান শাখা থেকে মাধ্যমিকে ২০২০-তে ৮৯.৫ শতাংশ নম্বর পায় সে। একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে মিশনের বজবজ শাখায় চলে আসে ওমেদুল্লা। মরহুম আব্বার চলে যাওয়ার পরে পরিবারের বড়োসন্তান হিসেবে দায়িত্বের কথা মাথায় রেখে মনে মনে ডাক্তারিকেই ভবিষ্যতের পেশা মান্য করে। ২০২২-এ উচ্চ-মাধ্যমিকে ৯১.৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে আশাবাদী হয়। রানিং বর্ষে নিটে পায় ১৯৮ নম্বর। বুঝতে পারে নিটের জন্যে নিরন্তর গভীর প্রস্তুতি দরকার। মিশনের পাঁচুড় শাখায় শুরু করে নিটের প্রস্তুতি। ২০২৩ ও ২০২৪-এ যথাক্রমে ৫৩৩ ও ৬০৬ নম্বর পেয়েও কাট অব মার্কস ছুঁতে পারেনি। পরের বছর শাখা পরিবর্তন করে খলিশানি শাখায় সেল্ফ স্টাডির ওপর খুব জোর দেয়। গত দু-বছরের ব্যর্থতাকে পরাজিত করে ২০২৫-এ ৫৫২ নম্বর পেয়ে সাফল্যকে ছুঁয়ে ফেলে। সন্তানের এই সাফল্যে তার মা আল্লাহ্‌র প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা জানান। নানা, নানি, ভাই-বোন ও আত্মীয়স্বজনের মুখে কেবলই ওমেদুল্লার গুণগান। ওমেদুল্লার বোন তামান্না মিশনের রামপুরহাট শাখায় নিটের কোচিং নিচ্ছে। আরেক বোন তানিয়া দশম শ্রেণি ও ভাই নাফিস অষ্টম শ্রেণিতে গ্রামের স্কুলে পাঠরত।

এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি অর্জনের পরে ওমেদুল্লার ইচ্ছে কার্ডিয়োলজিতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের। কারণ, রোগটি মহামারির আকার ধারণ করেছে। নিটে তাদের গ্রামের দ্বিতীয় সাফল্য ওমেদুল্লার। প্রথম জন গ্রামেরই এক ছাত্রী, যে আল-আমীনে কোচিং নিয়ে এখন এম.বি.বি.এস. পড়ছে। ওমেদুল্লা ও তার মায়ের মতে, আল-আমীন পরিবার এত কম বেতনে, বিশেষ করে নিটের প্রস্তুতির সুযোগ না দিলে এই সাফল্য দেখা সম্ভব হত না। এলাকাবাসীরা মনে করেন, আল-আমীন মিশন দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্যের সোপান। অনেকেই উদাহরণ হিসেবে ওমেদুল্লার নাম উচ্চারণ করে থাকেন। ■

মাউসুফ তামীম

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১১২১৭

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

মাউসুফ তামীম— মুর্শিদাবাদ জেলার ইসলামপুরের এক মেধাবী ও স্বপ্নবাজ তরুণ। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। পিতা আবু তাহের মণ্ডল গ্র্যাজুয়েট, একজন ব্যবসায়ী। অল্প কিছু জমিজমাও আছে তাদের। মা ময়না বেগমের পড়াশোনা মাধ্যমিক পর্যন্ত। তিনি গৃহবধূ। তামীমের এক দাদা ও এক দিদি আছেন। তাঁরা গ্র্যাজুয়েশন করেছেন। তামীমের বাবা-মা ছেলে-মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ দিয়ে তাদের মানুষের মতো মানুষ করতে চেয়েছেন। তাঁদের সেই চেষ্টার ফলেই মাউসুফ আজ ডাক্তার হতে চলেছে। আল-আমীন মিশনের তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করে মাউসুফের পরিবারের সকলের সম্মিলিত স্বপ্ন সফল হতে চলেছে।

শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই মাউসুফ ছিল অত্যন্ত মনোযোগী ও অধ্যবসায়ী মেধাবী মাউসুফ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আল-আমীন মিশনে পড়ার সুযোগ পায়। সে মিশনে পড়েছে ক্লাস সিক্স থেকে। পড়ত মহম্মদপুর শাখায়। ২০২০ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে পেয়েছিল ৯৮.৫ শতাংশ নম্বর। এরপর ২০২৩ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও সাফল্যের ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। পেয়েছিল ৯০ শতাংশ নম্বর।

ছোটোবেলা থেকেই মাউসুফ চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি গভীর আগ্রহী। তাই ঠিক করে নিয়েছিল সে ডাক্তার হবে। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে নিট

এম.বি.বি.এস. পড়ার স্বপ্ন ছুঁতে ব্যর্থ হওয়ায় হতাশ হয়ে লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে না দিয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে আরও এক বছর লড়াই চালায়। লেগে থাকার জেদ তাকে অবশেষে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য এনে দেয়।

কোচিং নেওয়া শুরু করে। গতবছর নিট পরীক্ষায় পেয়েছিল ৬১৬ নম্বর। র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ৫৯৭৫৯। এম.বি.বি.এস. পড়ার স্বপ্ন ছুঁতে ব্যর্থ হওয়ায় হতাশ হয়ে লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে না দিয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে আরও এক বছর লড়াই চালায়। লেগে থাকার জেদ তাকে অবশেষে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য এনে দেয়। এ-বছরের নিট (ইউজি) পরীক্ষায় সে ৫৫২ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় স্তরের র‍্যাঙ্ক করেছে ১১২১৭। মাউসুফ বিশ্বাস করে, "সাফল্য হঠাৎ আসে না। ধৈর্য, অধ্যবসায় আর ঠিক দিক্‌নির্দেশনাই স্বপ্নপূরণের মূল চাবিকাঠি।" মাউসুফ মনে করে আল-আমীন মিশনের পড়াশোনার পরিবেশ, নিয়মানুবর্তিতা আর সুপার স্যারের গাইড বড়ো বিষয়। নিট পরীক্ষায় সাফল্যের শর্ত হিসেবে মাউসুফ উল্লেখ করেছে, "অধ্যবসায়, উপযুক্ত গাইড, কোশ্চেন প্র্যাকটিশ আর যত পারা যায় মকটেস্ট দেওয়া।"

মাউসুফ নিউরো মেডিসিন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নিয়ে একজন দক্ষ ও মানবিক ডাক্তার হতে চায়। তার স্বপ্ন একদিন সমাজের অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের কষ্ট লাঘব করবে এবং দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার কাজে নিয়োজিত রাখবে নিজেকে। ■

সেখ জিনাতুল্লাহ হোসেন

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১১৪৪০

আই পি জি এম ই আর অ্যান্ড এস এস কে এম হসপিটাল

হাওড়া জেলার বাগনান থানার টেঁপুর গ্রামের সাধারণ এক পরিবারে জন্ম সেখ জিন্নাতুল্লাহ হোসেনের। পিতা-মাতার স্বপ্ন ছিল ছেলেকে ডাক্তার করার। অনেক লড়াইয়ের পরে সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। জিন্নাতুল্লাহ ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছে। আল-আমীন মিশন সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানের স্বপ্ন সফল করতে।

জিন্নাতুল্লাহর বাবা সেখ আবুল হোসেন উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করে টিউশনি করেন। মা আকলিমা বেগম পড়াশোনা করেছেন ক্লাস নাইন পর্যন্ত। তিনি গৃহবধূ। সংসারের টানাপোড়েনের মাঝেও তাঁরা ছেলের পড়াশোনার জন্যে প্রতিটি মুহূর্তে উৎসাহ দিয়েছেন। দিদি সুমাইয়া বিনতে হোসাইন বি.এ. পাস। তিনি বিবাহিতা। ছোট্ট সংসারে স্বপ্ন ছিল একটাই— জিন্নাতুল্লাহ যেন একদিন ডাক্তার হয়ে সমাজকে গর্বিত করে।

পড়াশোনার শুরু থেকেই মেধাবী জিন্নাতুল্লাহ। ২০১৯ সালে মাধ্যমিকে পেয়েছিল ৯২.২ শতাংশ নম্বর আর ২০২১ সালে উচ্চ-মাধ্যমিকে তার নম্বর ছিল ৮১.২ শতাংশ। এই সাফল্যই তাঁকে আরও বড়ো স্বপ্নের দিকে এগিয়ে দেয়। ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এবার সে পা রাখে আল-আমীন মিশনে। হাওড়ার খলিশানি শাখায় টানা তিন বছর নিটের কোচিং নিয়েছে। পরিবারের সীমিত আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে মিশন তাকে খুবই কম বেতনে কোচিং নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। শুধু পড়াশোনাই নয়, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিক দিক্‌নির্দেশনা, নিয়মিত মোটিভেশন এবং মানসিক সাহচর্য তার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয় বহু গুণে। আল-আমীন মিশনের এই সহায়তা না থাকলে হয়তো এতদূর পৌঁছোনো সম্ভব হত না। তাই জিন্নাতুল্লাহর ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাওয়ার পেছনে পরিবারের যেমন বিরাট অবদান আছে, তেমনি আল-আমীন মিশনও তার জীবনে এক আশীর্বাদের মতো।

দেশের অন্যতম কঠিন পরীক্ষা নিট। এই পরীক্ষায় সে এ-বার ৫৫২ নম্বর পেয়েছে। তার সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক হয়েছে ১১৪৪০। গতবছর ৬১৫ নম্বর পেয়েও সফল হতে পারেনি। তিন বছর চেষ্টার পরে পাওয়া সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত নয়, তার পরিবার ও গ্রামের জন্যেও এখন এক গর্বের বিষয়।

তবে এই সাফল্যের পথ মোটেও সহজ ছিল না। সাধারণ পরিবার থেকে সীমিত সুযোগ পেয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া, আর্থিক সংকটের সঙ্গে প্রতিদিন লড়াই করা এবং নিরন্তর পরিশ্রমই তাকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছে। অনেক সময় বাধা এসেছে, মনোবল দুর্বল হয়েছে, কিন্তু ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নের প্রতি অবিচল থাকার শক্তিই তাকে এগিয়ে দিয়েছে। জিন্নাতুল্লাহর প্রিয় বিষয় জীবনবিজ্ঞান। জীবনবিজ্ঞানের প্রতিটি অধ্যায় তাকে গভীরভাবে জীবজগৎকে জানতে অনুপ্রাণিত করে। ভবিষ্যতে সে জেনারেল মেডিসিনে এম.ডি. করতে চায়, যাতে আরও দক্ষ হয়ে অসংখ্য রোগীর জীবন বাঁচাতে পারে। তার প্রিয় ভারতীয় স্যার সৈয়দ আহমদ খানের জীবন ও চিন্তাধারা তাকে শিক্ষা দিয়েছে— সমাজ ও জাতির উন্নতির জন্যে শিক্ষার আলোই সবচেয়ে বড়ো শক্তি।

গ্রামীণ পরিবেশ থেকে উঠে আসা জিন্নাতুল্লাহ আজ অসংখ্য তরুণ-তরুণীর জন্যে এক অনুপ্রেরণা, সে প্রমাণ করেছে যে, বাবা-মায়ের উৎসাহ, নিজের একাগ্রতা, কঠোর পরিশ্রম এবং আল-আমীন মিশনের মতো প্রতিষ্ঠান পাশে থাকলে বড়ো স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব। ■

রেশমা সুলতানা

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১১৪৬৬

আর জি কর মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

"আমার আব্বা লেপ-তোশক তৈরি করে গ্রামে ফেরি করেন। মা গেরস্থ সামলান। দিদি বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এসসি. পাঠরত। আব্বা, মা কখনো স্কুলে যাননি। তাঁরা সব সময় চেষ্টা করেছেন আমাদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে। আব্বা মোট আয়ের অধিকাংশই আমাদের শিক্ষার জন্যে খরচ করেন। পাশাপাশি দিদি আমার পড়াশোনার যাবতীয় সবকিছুই দেখাশোনা করেছেন। এবং ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন।"— এক-নিশ্বাসে কথাগুলো বলল রেশমা সুলতানা। মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা থানার পাটিকাবাড়ি গ্রামের চার সদস্যের ভূমিহীন নিম্নবিত্ত পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যা রেশমা। তার বাবা মজিবর মিয়াঁ ও মা সাইমন বেগম উভয়েই নিরক্ষর। দিদি আয়েশা খাতুন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিয়োলজি বিষয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্রী। ২০২৫-এর নিট পরীক্ষায় সফল রেশমা মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস.-এর প্রথম বর্ষের ছাত্রী।

স্থানীয় প্রাইমারি স্কুল পেরিয়ে মেধাবী রেশমা পাটিকাবাড়ি হাই স্কুল থেকে ৯০.১৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করলে পরিবারের গৌরব বেড়ে যায়। স্কুলে পড়ার সময়ই সে কেবল আল-আমীনের নাম শুনেছিল। মাধ্যমিকের ভালো রেজাল্টে তার ইচ্ছে হয় আল-আমীন মিশনে ভর্তি হতে। কিন্তু সামান্য আয়ের পরিবারের একমাত্র বাধা অর্থ। তবুও মেয়ের জেদের কাছে হার মানেন আব্বা-মা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে ফেলে রেশমা। রেশমার চোখে-মুখে উজ্জ্বল উচ্চাশা এবং পারিবারিক অবস্থা বিবেচনায় মাত্র এক চতুর্থাংশ মাসিক বেতনে মিশন পরিবারে তার অন্তর্ভুক্তি ঘটে। মিশনের চাপড়া শাখায় শুরু হয় তার স্বপ্নপূরণের অভিযান। ২০২৩-এ উচ্চ-মাধ্যমিকে রেশমা ৮৩.৪ শতাংশ নম্বর পায়। মনের সুপ্ত ইচ্ছেকে সফল করতে ওই বছরই নিটে রেশমার প্রাপ্ত নম্বর ১৬৪। এতে রেশমার জেদ বাড়ে বই কমে না। রেশমা নিটের কোচিং নিতে চলে আসে মিশনের বারুইপুর শাখায়। ২০২৪-এ কোচিং নেওয়ার প্রথম বছরের অদম্য চেষ্টাতেই ৫৩৯ নম্বর পেয়ে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নকে আরও আঁকড়ে ধরে। মিশনের দক্ষ ফ্যাকাল্টিগণের পড়ানো, হস্টেলের নিরুপদ্রব পরিবেশ এবং নিজের অতুলনীয় স্টাডিতে ভর করে রেশমা হয়ে ওঠে তাদের গ্রামের প্রথম এম.বি.বি.এস. পড়ুয়া। দিদির মাধ্যমে সেই সুখবর বাড়িতে পৌঁছোলে খুশিতে রেশমাকে জড়িয়ে তার মায়ের অনিঃশেষ কান্না শুরু হয়। মুখে হাসি এবং চোখে জল নিয়ে আব্বা, আত্মীয়স্বজন সকলেই তাকে মিষ্টিমুখ করিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

রেশমা জানায়, ভবিষ্যতে সে একজন ভালো কার্ডিয়োলজিস্ট হতে আগ্রহী। কারণ, তাদের সন্নিহিত এলাকায়ও হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। তার আরও স্বপ্ন এলাকার দুঃস্থ ও যথোপযুক্ত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিতদের পাশে থাকা। সময় পেলে ছবি আঁকতে এবং এম এস ধোনির ক্রিকেট খেলা দেখতে তার বড়োই পছন্দ। রেশমা চায় মিশনের নিট কোচিঙে যুক্ত হোক বেশি বেশি মকটেস্ট ও টপিকটেস্ট এবং রিপিটারদের জন্যে ডাউট ক্লিয়ারিঙের আলাদা ক্লাস। আব্বা, মা, দিদি, মিশনের শিক্ষকগণ, বারুইপুর শাখার ইনচার্জ রাজীব স্যার ও রুশিয়া ম্যাম প্রমুখের অবদানে তার এই সাফল্য। নিট পরীক্ষার্থীদের সাফল্যের জন্যে তার পরামর্শ— কনসেপ্ট ক্লিয়ার রাখা, বেশি বেশি প্রশ্নের অনুশীলন, কার্যকরী নিবিড় পরিশ্রমী পড়াশোনা এবং অবশ্যই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। ■

সেরাজুদ্দিন সেখ

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১১৪৯৭

আর জি কর মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

বীরভূম জেলার পাইকর থানার করমজী গ্রামের সাধারণ কৃষকপরিবার থেকে উঠে এসে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাওয়ায় সেরাজুদ্দিন সেখ আজ হয়ে উঠেছে অনুপ্রেরণার এক নাম। পাড়া ছাড়িয়ে তার নাম এখন ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সেরাজুদ্দিনের পরিবারের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যেতে শুরু করেছে। এভাবেই এক-একটি পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বলা যায় রাতারাতিই বদলে যাচ্ছে। এই বদল প্রক্রিয়ায় অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে আল-আমীন মিশন।

সেরাজুদ্দিন আল-আমীন মিশনে পড়েছে ক্লাস সিক্স থেকে। পড়ত বীরভূমের পাপুড়ি শাখায়। পারিবারিক আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। পিতা মহম্মদ এব্রাহিম একজন স্নাতক হলেও চাষবাস করে সংসার চালান। মাসিক আয় খুব বেশি নয়। মা নুরেসলিমা বিবি পড়াশোনা জানেন না। তিনি গৃহিণী। সেরাজুদ্দিন পরিবারের একমাত্র সন্তান। আর্থিক প্রতিকূলতার চাপে অনেকেই বড়ো স্বপ্ন দেখতে ভুলে যায়। সেরাজুদ্দিনের পিতা আল-আমীন মিশনের কথা জানতেন। মেধাবীদের পাশে মিশনকে পাবেন, সেই ভরসা ছিল। মিশন সেই প্রত্যাশা পূরণ করেছে, সেরাজুদ্দিনকে খুবই সামান্য বেতনে মিশনে পড়ার সুযোগ দিয়েছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে নিরলস পরিশ্রম করে গেছে। তবেই ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে আজ সে এম.বি.বি.এস.-এর ছাত্র।

মেধাবী সেরাজুদ্দিনের রেজাল্টের দিকে তাকালে আমরা দেখব ২০২২ সালে মাধ্যমিকে ৮১ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে উচ্চ-মাধ্যমিকে ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়েছিল। মাধ্যমিকের পরে উচ্চ-মাধ্যমিকে অনেকটা বেশি নম্বর পাওয়া তাকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। পাশাপাশি রানিং ইয়ারে নিট পরীক্ষায় বসে ৫২২ নম্বর পাওয়াও মনোবল অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। এরপর শুরু হয় নিটের প্রস্তুতি। এখানেই তার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে আল-আমীন মিশন। মিশনের শিক্ষকদের কঠোর পরিশ্রম, তাঁদের গাইড এবং অনুপ্রেরণা আর নিয়মিত মকটেস্ট দেওয়া, তাকে ধাপে ধাপে এগিয়ে দেয় সাফল্যের দিকে। ২০২৫ সালের নিট (ইউজি) পরীক্ষায় সে পেয়েছে ৫৫২ নম্বর। সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক হয়েছে ১১৪৯৭। সেরাজুদ্দিন স্বীকার করে— "আমার যাত্রা আল-আমীন মিশনের সহায়তা ছাড়া সম্পূর্ণ হত না।" তা ছাড়া নিট-পরীক্ষার্থীদের জন্যে তার পরামর্শ— "মোর স্টাডি, মোর প্র্যাকটিশ অ্যান্ড অ্যাটেম্পট মোর মকটেস্ট।" এই তিনটিই সাফল্যের মূলমন্ত্র।

সেরাজুদ্দিনের প্রিয় বিষয় ফিজিক্স, আর অবসরে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায় ফুটবল খেলে। প্রিয় বাঙালি হিসেবে সেরাজুদ্দিন মিশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলামের কথা উল্লেখ করেছে। ভবিষ্যতে সেরাজুদ্দিনের লক্ষ্য এম.বি.বি.এস. শেষ করে এম.ডি. ডিগ্রি অর্জন করা। তার বিশ্বাস, চিকিৎসক হওয়া শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, এটি মানুষের সেবা করার এক মহান সুযোগ। ছোট্ট গ্রাম থেকে উঠে এসে দেশের বৃহত্তম প্রেক্ষাপটে নিজের জায়গা করে নেওয়ার যে-সংগ্রাম সেরাজুদ্দিন করছে, তা অসংখ্য তরুণ-তরুণীকে অনুপ্রাণিত করবে বলে আশা করা যায়। ■

রনি সেখ

সর্বভারতীয় র‌্যাঙ্ক ১৩৩৪৭

এন আর এস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

রনি সেখ উত্তর চব্বিশ পরগনার দত্তপুকুর থানার ময়নাগদি গ্রামের এক তরুণ, যার চোখে খেলা করে বড়ো কিছু করার স্বপ্ন। যদিও তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তার পিতা নাসির হোসেন একজন দিনমজুর। পড়াশোনা করেছেন ক্লাস এইট পর্যন্ত। মা সালেহা বিবি আবার কোনো পড়াশোনাই জানেন না। তিনি গৃহিণী। পরিবারের মাসিক আয় খুবই কম। তার ওপর আছে দুই সন্তানের পড়াশোনা। রনির এক ভাই আছে— টনি সেখ। সে ক্লাস টুয়েলভের ছাত্র। আর্থিকভাবে দুর্বল এক পরিবারে জন্ম নিয়েও রনি নিজেকে স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে অদম্য ইচ্ছেশক্তি ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে। তার ও তার পরিবারের লড়াইয়ের সাথি হিসেবে আল-আমীন মিশন পাশে দাঁড়ানোর ফল হয়েছে চমৎকার। সে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছে।

রনি সেখ আল-আমীন মিশনে পড়েছে ক্লাস নাইন থেকে। ২০২০ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসাধারণ সাফল্য অর্জন করে। পায় ৯৪.২৯ শতাংশ নম্বর। ২০২২ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পায় ৯০ শতাংশ নম্বর। পারিবারিক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও ধারাবাহিক ভালো ফল তাকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, যা তাকে নিট প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করে। ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন ছুঁতে তাকে তিন বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। গতবছর ৫৮৯ নম্বর পেয়েও স্বপ্ন সফল করতে পারেনি।

রনির মত হল, আল-আমীন মিশন তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। শিক্ষকদের নিরলস পরিশ্রম, মেন্টরশিপ, নিয়মিত মকটেস্ট এবং ইতিবাচক পরিবেশ তাকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

এ-বছরের নিট (ইউজি) পরীক্ষায় সে ৫৪৮ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় স্তরে র‌্যাঙ্ক করেছে ১৩৩৪৭। এই সাফল্যকে পাথেয় করে জীবনের নতুন যাত্রা শুরু করেছে রনি সেখ। রাজ্যের অন্যতঅম সেরা মেডিকেল কলেজ এন আর এস মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. পড়ার সুযোগ পেয়েছে সে। নিজের সাফল্যের পেছনে থাকা তিনটি কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে জানিয়েছে, "সেল্ফ স্টাডি, মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করা আর নিয়মিত নামাজ আদায় করা।"

আর মিশন সম্পর্কে রনির মত হল, আল-আমীন মিশন তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। শিক্ষকদের নিরলস পরিশ্রম, মেন্টরশিপ, নিয়মিত মকটেস্ট এবং ইতিবাচক পরিবেশ তাকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ভবিষ্যতে রনি ডাক্তার হয়ে মেডিসিন শাখায় উচ্চশিক্ষা নিতে চায়। শুধু পড়াশোনাই নয়, খেলাধুলায়ও রনির আগ্রহ রয়েছে। সে ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে। তার প্রিয় বিষয় ফিজিক্স, প্রিয় ব্যক্তিত্ব বিজ্ঞানী এ পি জে আবদুল কালাম, আর প্রিয় ডাক্তার ডা. বিধানচন্দ্র রায়। এই মহৎ ব্যক্তিদের জীবন ও কর্ম তাকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করে। ■

ওয়াসিম সাফাজ

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৩৯৫২

এন আর এস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

ঠিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাছাই করতে না পারলে জীবন থেকে কীভাবে মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যায় তার উদাহরণ হতে চলেছে এই লেখাটি। এনেক ক্ষেত্রে আবার এমনটাও দেখা যায় যে, কেবল সময় নষ্ট নয়, জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেছে। পড়াশোনার জগৎ থেকেই ছিটকে গেছে। অবশ্য এ-লেখায় যার কথা বলছি সে তার জীবনের সময় নষ্টের কথাই আমাদের জানিয়েছে। আমরা কথা বলছি মালদা জেলার চাঁচল থানার জালালপুর গ্রামের ওয়াসিম সাফাজকে নিয়ে।

আরজাউল হক মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। নিজেদের বিঘে সাতেক জমি আছে। তাঁর স্ত্রী মোসাম্মৎ সামসুন নেহার পড়েছেন ক্লাস এইট অবধি। গৃহকর্ম নিয়েই থাকেন তিনি। তাঁদের দুই সন্তান। এক কন্যা, এক পুত্র। সীমিত উপার্জন সত্ত্বেও কন্যা ও পুত্রকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার স্বপ্ন দেখতে ভুল করেননি আরজাউল সাহেব। তাঁর কন্যা আয়েশা সুলতানা আজ এম.এ. পাস। একমাত্র পুত্র ওয়াসিম সাফাজ হতে চলেছে ডাক্তার। এ-বছরের নিট (ইউজি) পরীক্ষায় সে ১৩৯৫২ র‍্যাঙ্ক করেছে। পেয়েছে ৫৪৬ নম্বর।

ওয়াসিমকে এই সাফল্য পেতে অনেক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। পিতার সীমিত উপার্জনের কারণে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা ছিল একটা বড়ো বিষয়। অনেক সময় বাধা-বিপত্তি আবার অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা করে তা অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার। ওয়াসিম তার পরিবেশ-পরিস্থিতি দেখে উপলব্ধি করেছিল শিক্ষাকে হাতিয়ার করেই তাকে সবকিছু জয় করতে হবে। সেই ভাবনা থেকেই সে শিক্ষাজীবনকে গুরুত্ব দিতে শুরু করে। সেটা অবশ্য মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে। তাই মাধ্যমিক পরীক্ষায় খুব ভালো ফল করতে পারেনি। ২০১৮ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে পেয়েছিল ৭৫.৫৭ শতাংশ নম্বর। উচ্চ-মাধ্যমিকে অবশ্য সে ভালো ফল করে। পায় ৯০.৪ শতাংশ নম্বর। এরপর শুরু হয় আসল লড়াই। ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে সে একটি সংস্থায় আবাসিক হিসেবে কোচিং নিতে শুরু করে। পর পর চার বছর সে ব্যর্থ হয়েছে। পাঁচ বছরের মাথায় এসে সে সফল হতে সক্ষম হয়েছে। এই যে চার বছর ধাক্কা খেয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ানো, তা অনেকটা বক্সিং রিঙে প্রতিপক্ষের ঘুষির আঘাতে পড়ে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর মতো। নিজের সাফল্য পাওয়া প্রসঙ্গো ওয়াসিম জানিয়েছে, “আমি একজন ফোর ইয়ার ড্রপার। ২০২০ সাল থেকে একটি কোচিং সেন্টারে কোচিং নিচ্ছিলাম। কিন্তু, সফলতা আমার হাতে ধরা দেয়নি। তাই আব্বা ও মা সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকে আল-আমীন মিশনে দেয়। এখানে এক বছর কোচিং নেওয়ার পরই আমি নিট ক্লিয়ার করতে পারলাম। এর পেছনে মিশনের পড়াশোনার পরিবেশ, নিয়মমাফিক ও কৌশলভিত্তিক পড়াশোনা এবং সেক্রেটারি স্যারের মোটিভেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।” সফল না হওয়া পর্যন্ত কীভাবে লড়াই জারি রাখে সে-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে ওয়াসিম জানায়, “আমার যত ড্রপ বাড়তে থাকে কনফিডেন্স তত কমতে থাকে। কিন্তু আমার হারানো কনফিডেন্স বাবা-মা রিস্টোর করতেন এই বলে যে, আল্লাহ্ তোমার এইরকম পরিশ্রমে রাজি নন। আরও পরিশ্রম করো। তখন আমি আরও পরিশ্রম করা শুরু করি। আমার আব্বা-মা নিট পরীক্ষার এক মাস আগে থেকে রোজ রাতে নামাজ পড়তেন ও দোয়া করতেন। এখন নিট ক্লিয়ার করার পরে আমার মনে হয় আমার পরিশ্রমের সঙ্গো আব্বা-মায়ের দোয়ার জন্যেও সাফল্য পেয়েছি।” ■

তসলিমা নাসরিন

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৩৯৯৮

আই পি জি এম ই আর অ্যান্ড এস এস কে এম হসপিটাল

আল-আমীন মিশন তাদের এলাকায় অত্যন্ত খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান। সেই সূত্রেই মিশনে পড়ার আগ্রহ তসলিমার। ধুলাউড়ি প্রাইমারি স্কুল পেরিয়ে হাই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে সে ভর্তি হয়। মাত্র এক বছর এই প্রতিষ্ঠানে পড়ার পরই মিশনে পড়ার স্বপ্নপূরণে আল-আমীনের প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করে। ষষ্ঠ শ্রেণিতে আল-আমীন রেসিডেন্সিয়াল একাডেমি নওদার হস্টেলের আবাসিক হয়ে যায়। ২০২২ সালে এখান থেকেই ৯০.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করে সাফল্যের সঙ্গে। তসলিমা উচ্চ-মাধ্যমিকের পরীক্ষা দেয় মিশনের ফরাক্কা শাখা থেকে। ২০২৪-এ এই পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৪.৮ শতাংশ। মিশনের মহেশতলা শাখায় এক বছরের নিটের প্রস্তুতি নিয়ে তসলিমা ৫৪৬ নম্বর পেয়ে স্বপ্ন পূরণ করে ফেলে।

অতুলনীয় এই সাফল্যের খবরে তসলিমার মা বাঁধভাঙা কান্নায় ডুবে যায়। তসলিমার বয়স যখন মাত্র চার বছর, সেই সময় তার আব্বা অয়জুদ্দিন ব্রেন স্ট্রোকে ইন্তেকাল করেন। পাহাড়প্রমাণ সেই শূন্যতাকে বুকে চেপে দুঃখকষ্টের লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে সন্তানদের লালনপালন করেছেন। আত্মীয়স্বজন, বিশেষ করে তসলিমার নানা-নানি আর্থিক প্রশ্নে সহায়তা করেছেন। মাধ্যমিক পাস তসলিমার আব্বা ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পরে তসলিমার মা নাসিরা বিবি সংসার নির্বাহে দর্জির কাজ শুরু করেন। তিনি মাত্র নাইন ক্লাস পর্যন্ত পড়েছেন। তার দাদা সাকিল আনসারি প্যারামেডিকেল কোর্স ডিএমএলটি করছেন। বোন নাজমা নাসরিনও তসলিমার মতো ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে নিটের কোচিং নেওয়া পর্যন্ত মিশনে পড়াশোনা করেছে। সেও এ-বছর বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস. পড়তে ভর্তি হয়েছে। আসলে তসলিমা ও নাজমা যমজ বোন। দু-জনের মধ্যে নাজমা বড়ো। তসলিমাদের বসবাস মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা থানাধীন বালিপাড়া গ্রামে। এ-বছর দু-বোনের সাফল্যকে ধরলে এই গ্রামের মোট চার জন এম.বি.বি.এস. পাস করেছে বা এখনও পড়ছে। চার জনই আল-আমীনের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী।

তসলিমা ভবিষ্যতে কার্ডিয়োলজি বিষয়ে এম.এস. করতে আগ্রহী। এই পেশায় তার আসার কারণ হল, অন্য পেশায়ও সমাজের উপকার সম্ভব। কিন্তু, ডাক্তারিতে সরাসরি মানুষের সেবা করার সুযোগ পাওয়া যায়। তার আরও ইচ্ছে এলাকার সুবিধাবঞ্চিতদের সুলভে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান। নিয়মিত একাগ্রতার সঙ্গে পড়াশোনা, রিভিশনের অভ্যেস, মকটেস্ট এবং প্রশ্নের এনালিশিস করা নিটে সাফল্যের জন্যে খুবই জরুরি। এ ছাড়া ভুল শোধরানোর আগ্রহ, সময় ম্যানেজমেন্ট এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সুস্থতাও দরকার। তার মতে মিশনের নিট ক্যাম্পাসে ডাউট ক্লিয়ারিঙের সেশন বাড়ানো, টাইম ও স্ট্রেস ব্যবস্থাপনার বন্দোবস্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। অবসর সময়ে গল্প উপন্যাস পড়তে এবং টেনিস খেলা দেখতে তার খুব ভালো লাগে।

তসলিমা জানায়, “আব্বা চলে যাওয়ার পরে আমাদের পড়াশোনা নিয়ে মা খুবই চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু, প্রায় শূন্য টাকায় আমাকে মিশনে ভর্তির সুযোগ করে দেন সেক্রেটারি স্যার।” তসলিমা আরও বলে, “আল-আমীন মিশন আমাকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত সাহায্য করেছে। মিশনে বহু বছর ধরে হস্টেলে থেকে লেখাপড়া করেছি। এর ফলেই আমার এই সাফল্য। আল-আমীন পরিবারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।” ■

নাসরিন সুলতানা

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৪৩২৫

ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

নাসরিন সুলতানার পিতা সেখ জসিমউদ্দীন আহমেদ হোমিয়োপ্যাথি ওষুধের ব্যাবসা করেন। মা নাজিয়া সুলতানা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। নাসরিনের পিতা চিকিৎসা-পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণেই তাঁর মনের আকাশে একটা স্বপ্ন বাসা বাঁধে। কন্যাকে তিনি ডাক্তার করবেন। সেই স্বপ্ন সফল করার জন্যে আল-আমীন মিশন হয়ে ওঠে তাঁদের প্রথম পছন্দের প্রতিষ্ঠান। কারণ, তাঁরা জানেন আল-আমীন মিশন কেবল স্বপ্ন দেখায় না, স্বপ্ন পূরণও করে। সত্যি সত্যি জসিমউদ্দীন আহমেদের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। তাঁদের কন্যা এ-বছর ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছে। নাসরিনদের বাড়ি হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া থানার বৈঁচি গ্রামে। বাড়িতে তার এক বোন আছে। ফারহিন সুলতানা। সে বাড়ির কাছে এক সরকারি হাই স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়ে।

নাসরিন সুলতানা আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয় অষ্টম শ্রেণিতে। পড়ত আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখায়। বাবা-মা দু-জনেই উপার্জন করেন, তাই সচ্ছল পরিবার হিসেবে পূর্ণবেতন দিয়েই মিশনে নাসরিনকে পড়িয়েছেন তার বাবা-মা। তিন বছর খলতপুর শাখায় পড়ার পরে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে ২০২২ সালে। পায় ৯২ শতাংশ নম্বর। এরপর উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনার জন্যে আসে সাঁতরাগাছি শাখায়। ২০২৪ সালে উচ্চ-মাধ্যমিকে পায় ৯১ শতাংশ নম্বর। মাধ্যমিক ও

> **মাত্র এক বছরের প্রস্তুতিই তাকে এনে দিয়েছে সাফল্যের বার্তা। এ-বছরের নিট (ইউজি) পরীক্ষায় সে পেয়েছে ৫৪৬ নম্বর। সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক হয়েছে ১৪৩২৫।**
>
> “

উচ্চ-মাধ্যমিকে দুর্দান্ত ফল নিট পরীক্ষায় ভালো ফল করার সম্ভাবনা স্পষ্ট করে দেয়। গতবছর নিট পরীক্ষায় নাসরিন পেয়েছিল ৫৯৬ নম্বর। স্বপ্ন পূরণ না হওয়ায় এ-বার কেবল নিটের জন্যেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। মাত্র এক বছরের প্রস্তুতিই তাকে এনে দিয়েছে সাফল্যের বার্তা। এ-বছরের নিট (ইউজি) পরীক্ষায় সে পেয়েছে ৫৪৬ নম্বর। সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক হয়েছে ১৪৩২৫। সে এম.বি.বি.এস পড়ার সুযোগ পেয়েছে ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে। নাসরিন জানিয়েছে নিট পরীক্ষায় সফল হওয়ার মন্ত্র একটাই— হার্ড ওয়ার্ক। পরিশ্রমের যে বিকল্প নেই, সেই কথাই ধ্বনিত হয়েছে নাসরিনের মুখে। সে সেই পরিশ্রমকেই হাতিয়ার করে উচ্চশিক্ষায় পা রাখতে আগ্রহী। মেডিসিন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতে চায়। আর আল-আমীন মিশন সম্পর্কে তার ভাবনা হল— “সবাই খুব হেল্পফুল। ফলে কঠিন লড়াইও সহজ হয়ে যায় সকলের সম্মিলিত চেষ্টায়।” নাসরিনের প্রিয় বিষয় ফিজিক্স। সে পড়াশোনা করতেই বেশি ভালোবাসে, তবে খেলার মধ্যে ক্রিকেট তার প্রিয় খেলা। যদিও সে খেলে না, দেখতে পছন্দ করে। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু তার প্রিয় বাঙালি ব্যক্তিত্ব, তেমনি বিজ্ঞানী এ পি জে আবদুল কালাম প্রিয় ভারতীয়। এই দুই বিজ্ঞানীর নামোল্লেখ নাসরিনের বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসাকেই তুলে ধরে সকলের সামনে। ■

সামিম সেখ

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৪৩৪৯

ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

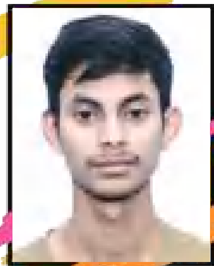

দিল্লিতে দর্জির কাজ করতেন। লেখাপড়া যৎসামান্যই। শরীরে মারণ ব্যাধি ক্যানসার ধরা পড়লে নিম্নবিত্ত পরিবার সাধ্যমতো চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। সমস্ত চেষ্টাকে বিফল করে ২০১০ সালে মাইজুর সেখ ইন্তেকাল করেন। মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘি থানার জুগোর গ্রামে তাদের বাসস্থান। স্বামীর অকালপ্রয়াণে কেবলই নামটুকু সই করতে সক্ষম নুরজাহান বিবি চরম অসহায়তায় পড়েন। দুই সন্তান— প্রায় ৬ বছরের কন্যা বেনুয়ারা এবং ৪ বছরের পুত্র সামিমের লেখাপড়ার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কুলকিনারা পান না। এই পরিস্থিতিতে ওই জেলারই নবগ্রামে তাঁর বাবার বাড়িতে পাকাপাকিভাবে দুই সন্তানকে নিয়ে চলে আসেন। পরিস্থিতি বিবেচনায় এটাই যুক্তিযুক্ত ছিল নুরজাহান বিবির জন্যে। এখানেই পড়াশোনা শুরু করে ভাই-বোন। বেনুয়ারা এখন কে এন কলেজে স্নাতক স্তরের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। আর সামিম এম.বি.বি.এস.-এর প্রথম বর্ষের ছাত্র।

প্রাইমারি স্কুল পেরিয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে খড়গ্রাম থানার ইন্দ্রাণী হাসনা মায়ানী হাই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয় সামিম। ২০২২ সালে মাধ্যমিকে পরীক্ষায় ৯২.৪ শতাংশ নম্বর পায়। তার দিদি একজন স্যারের কাছ থেকে জেনে আল-আমীনের ভর্তির পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করে দেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাসও করে ফেলে সামিম। তবে পড়ানোর খরচের প্রশ্নে দ্বিধায় পড়ে যান তার মা। অবশেষে সামিমকে সঙ্গে নিয়ে তার মা মিশনের সেক্রেটারি স্যারের সামনে উপস্থিত হন। স্যার একেবারে নামমাত্র মাসিক বেতনে সামিমকে গোলাবাড়ি শাখায় ভর্তি করে নেন। একাদশ শ্রেণিতে গোলাবাড়িতে এসে সামিম ধীরে ধীরে হস্টেলে থেকে পড়াশোনাকে ভালোবেসে ফেলে। এ ছাড়া তার আব্বার অকালপ্রয়াণের ধাক্কায় মনস্থির করে ফেলে চিকিৎসাবিদ্যাকে ভবিষ্যতের জীবিকা হিসেবে নেওয়ার। সে ২০২৪-এ ৮৯.৪ শতাংশ নম্বর পায় উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায়। রানিং বর্ষে নিটের পরীক্ষায় বসে ৩৬৬ নম্বর পায়। এই শাখাতেই শুরু করে নিটের প্রস্তুতি ও বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের ধারাবাহিক অনুশীলন। ২০২৫-এ নিটের ফল প্রকাশিত হলে সামিমদের বাড়ির সকলের মুখে হাসি ও মন খুশিতে ভরে ওঠে। সামিম ৫৪৬ নম্বর পেয়ে তার স্বপ্ন পূরণ করে ফেলেছে। সামিমের আব্বা চলে যাওয়ার পরে এই প্রথম তারা সকলেই এমন করে আনন্দ করল যেন।

সামিমের মাও সন্তানের সাফল্যে তৃপ্ত। আনন্দের অশ্রুতে জড়িয়ে ধরে সামিমকে। বলতে থাকেন, সামিমের আব্বার হায়াত থাকলে আজ কতই-না খুশি হতেন। গ্রামবাসীরাও এই আনন্দোৎসবে সামিল হন। সামিমের মতো পরিশ্রম করে জীবন গড়ে নেওয়ার জন্যে নিজেদের ছেলে-মেয়েকে উপদেশ দিচ্ছেন। সাফল্যের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে সামিম। নিটে জুগোর গ্রামের প্রথম সাফল্যের পাশাপাশি নানা-নানির গ্রামের দ্বিতীয় সাফল্যের মুকুটও তার মাথায় উঠেছে। সামিমের ইচ্ছে ভবিষ্যতে মেডিসিন নিয়ে এম.ডি. করার। খুশির এই মুহূর্তে সামিমের মা নুরজাহান বিবি মিশনের সেক্রেটারি স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মিশনের তরফে খুব কম বেতনে পড়াশোনার সুযোগ না পেলে সামিমের এই সাফল্য হয়তো সম্ভব হত না। সামিম জানায়— নানা, নানি, মামা, দিদি, মা সকলের দোয়াতেই তার এই সাফল্য। সামগ্রিকভাবে আল-আমীন মিশন ও বিশেষ করে গোলাবাড়ি শাখার ইনচার্জ ইনজামামুল হকও তার সাফল্যে বড়ো ভূমিকা রেখেছেন। ■

মহম্মদ ওমর ফারুক মণ্ডল

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৫৪২২

কলেজ অব মেডিসিন অ্যান্ড সাগর দত্ত হসপিটাল

আল-আমীন মিশনের দেখানো পথ ধরে রাজ্যে অনেক আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কিন্তু, আল-আমীন মিশন নিট কোচিং দেওয়ার যে-ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলেছে, তা অন্যরা করতে পারেনি। আল-আমীন মিশনের নিট পরীক্ষার সাফল্যের হারও খুবই ভালো। তাই অন্য মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেও নিট কোচিঙের সেরা প্রতিষ্ঠান আল-আমীন মিশন। তাই অনেক ছাত্র-ছাত্রী ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে আল-আমীন মিশনকেই বেছে নেয়।

মহম্মদ ওমর ফারুক মণ্ডল সেরকমই এক ছাত্র। বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার শক্তিগড় থানার ঘাটশিলা গ্রামে। পিতা মরহুম বোরহান মণ্ডল। তিনি ছিলেন বি.কম. পাস। চাষবাস ছিল তাঁর জীবিকা। বোরহান মণ্ডল অকালপ্রয়াত হওয়ায় পরিবারকে পড়তে হয় কঠিন পরিস্থিতির মুখে। ওমর ফারুকের মা হাসনারা বেগম মণ্ডল পড়েন অথই সাগরে। মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করা সাধারণ গ্রামীণ পরিবারের একজন গৃহবধূর পক্ষে যতটা হাল ধরা সম্ভব তার চেয়েও বেশি চেষ্টা চালিয়ে তিনি দুই সন্তানকে মানুষ করতে শুরু করেন। সেই চেষ্টার দৌলতে ওমর ফারুকের দিদি বি.এ. পাস করেছেন। আর ওমর ফারুক হতে চলেছে এম.বি.বি.এস. ডাক্তার।

ওমরের শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল বর্ধমানের একটি আবাসিক মিশনে। ২০২০ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে পেয়েছিল ৯০ শতাংশ নম্বর। আর দু-বছর পরে উচ্চ-মাধ্যমিকে পেয়েছিল ৮৯ শতাংশ নম্বর। রাজ্য স্তরের দুটো বড়ো পরীক্ষায় ভালো ফল করে সে নিজের মেধার একটা পরিচয় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। এর পরই আসে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন সফল করার দৌড়। মানুষের জীবনে স্বপ্নই হল এগিয়ে যাওয়ার প্রধান চালিকাশক্তি। স্বপ্ন যত বড়ো হয়, সংগ্রামও তত বড়ো হয়। এরপর যথেষ্ট পরিশ্রম করেও পর পর দু-বছর— ২০২৩ ও ২০২৪ সালের নিট (ইউজি) পরীক্ষায় সফল হতে পারেনি ওমর ফারুক। তখন সে সিদ্ধান্ত নেয় আল-আমীন মিশনে নিটের কোচিং নেওয়ার। এই একটা সিদ্ধান্তই তাকে পৌঁছে দেয় সাফল্যের দোরগোড়ায়। আল-আমীন মিশনের দিক্‌নির্দেশনা আর সেই দিক্‌নির্দেশনা মেনে করা পরিশ্রম এতিম ওমর ফারুকের জীবন বদলে দিয়েছে বলা যায়। আর কয়েক বছর পরেই সে নিজেকে একজন ডাক্তার হিসেবে সমাজের সামনে তুলে ধরতে পারবে। ২০২৫ সালের নিট (ইউজি) পরীক্ষায় সে পেয়েছে ৫৪৩ নম্বর। সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক হয়েছে ১৫৪২২।

ওমরের লড়াইয়ে আল-আমীন মিশন যথেষ্ট পাশে থাকার চেষ্টা করেছে। মিশন বরাবর এতিম ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। ওমর ফারুককেও মিশন অনেকটা কম বেতনে পড়ার সুযোগ দিয়েছে। আল-আমীন মিশন নিয়ে তার মতামত হল, “আমি মনে করি আর্থিকভাবে দুর্বল, কিন্তু মেধার দিক দিয়ে শক্তিশালী এমন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আল-আমীন মিশন একটা আশ্রয়।”

ওমরের ভবিষ্যতের স্বপ্ন হল সে একজন নিউরোলজিস্ট হতে চায়। পড়াশোনার পাশাপাশি ওমরের আগ্রহ আছে খেলাধুলাতেও। ক্রিকেট তার প্রিয় খেলা। রসায়ন তার প্রিয় বিষয়। প্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে সে মোটিভেশনাল স্পিকার মনোয়ার জামানের নাম উল্লেখ করেছে।

ওমর ফারুকের সাফল্য আগামী দিনের শিক্ষার্থীদের সামনে এই কথাই স্পষ্ট করে দেয় যে, জীবন যতই কঠিন হোক-না-কেন, মেধা আর বিশ্বাস থাকলে সফলতা নিশ্চিত। ■

সেক আরেফুল

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৬১৭৩

এন আর এস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

"পারিবারিক দারিদ্র্যই সবচেয়ে বড়ো মোটিভেশন ও এনার্জির উৎস।"— এক প্রশ্নের জবাবে জানায় সেক আরেফুল। স্থানীয় নার্সারি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পরে প্রতিবেশী গ্রামের পূর্ব চিল্কা লালচাঁদ হাই স্কুলে ভর্তি হয় আরেফুল। এই শিক্ষালয় থেকে ২০১৭ সালে ৯৩ শতাংশ নম্বর নিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। একটি দৈনিকের বিজ্ঞাপন দেখে আল-আমীনের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির ফর্ম ফিলাপ করে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে আরেফুল উলুবেড়িয়া শাখায় শুরু করে লেখাপড়া। ২০১৯-এ উচ্চ-মাধ্যমিকে তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৪ শতাংশ। ওই বছরে নিটে তার রেজাল্ট খুব একটা উল্লেখনীয় নয়।

পরবর্তী সময়ে মিশনের হস্টেলে নিট ক্র্যাক করার অদম্য লড়াইয়ে হয় সামিল। ২০২০ সালে উলুবেড়িয়া ও ২০২১-এ বজবজ শাখা থেকে নিটে যথাক্রমে ৪৮২ ও ৪৯৪ নম্বর পায়। করোনাকালে বাড়িতে থেকে অনলাইনে ক্লাসের বিড়ম্বনাতেও উজ্জীবিত থাকে। ২০২২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত তিন বছর নিটের প্রস্তুতি নিয়েছে উনসানি শাখায়। এই পর্বে তার প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে ৫৬০, ৫৮৫, ৫৮৫। ২০২২-এ বর্ধমান ডেন্টাল কলেজে ভর্তি হয়েও ক্লাস না করে নিটের প্রস্তুতি চালু রাখে। পরের বছর ২০২৩-এ ২ নম্বরের জন্যে এম.বি.বি.এস. পড়ার সুযোগ পায়নি, যদিও আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজে ভর্তির সুযোগ আসে। বার বার নিট ক্র্যাক না করতে পারলেও নিজের চেষ্টা ও এনার্জি পুরোদমেই বজায় ছিল। তার নিট অভিযানের সফল সমাপ্তি ঘটল ২০২৫ সালে। এ-বছর সে পেয়েছে ৫৪২ নম্বর। সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৬১৭৩ করে কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস. পড়তে চলেছে।

আরেফুলের জন্মস্থল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার সাধুয়াপোতা গ্রামে। তার আব্বা সেক আরববিল্লা কৃষিজীবী মানুষ। কাঠা পাঁচেক জমির চাষাবাদেই মুখ্যত সংসার চলে। মা আতারুনেশা বেগম গৃহকর্ত্রী। উভয়েই নামমাত্র পড়াশোনা করেছেন। তার দিদি খাদিজা ও মারুফা এবং বোন সুরাইয়া বিবাহিতা। তাঁদের পড়াশোনা যথাক্রমে নবম শ্রেণি, নবম শ্রেণি ও মাধ্যমিক পাস করা পর্যন্ত। একমাত্র ভাই গওশুল মাধ্যমিক পাস করে সোনার কাজ শিখছে। তাদের ইটের দেয়ালের বাড়ি এবং ছাউনি ত্রিপলের। এই পরিবারেরই সন্তান আরেফুল। আরেফুল জানায়, ভবিষ্যতে এম.ডি. করে সে জেনারেল ফিজিশিয়ান হতে আগ্রহী।

প্রায় সমান সমান হিন্দু-মুসলমানের বাস তাদের গ্রামে। শিক্ষাদীক্ষায় চাকুরিজীবীর সংখ্যায় হিন্দু সমাজ মুসলমান অংশের চেয়ে বহু কদম এগিয়ে। মুসলমানপাড়ায় চাকুরিজীবী বলতে একজন স্কুলের পিয়োন মাত্র। অধিকাংশ জনই ক্ষুদ্র চাষি, টোটোচালক, রাজমিস্ত্রি প্রভৃতি শ্রমনির্ভর কাজের সঙ্গে যুক্ত। সেই জনপদের উজ্জ্বল তারকা আরেফুলের মতামত শোনা যাক— "মাধ্যমিক দেওয়ার পরে আমার একটাই স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হতে হবে। তার জন্যে মিশনে ভর্তি হতে হবে। ভয় ছিল এত টাকা আমার আব্বা পাবেন কোথায়? কিন্তু মিশনের সেক্রেটারি স্যার খুবই কম মাসিক বেতনে আমাকে ভর্তির সুযোগ করে দেন। আজ আমি সরকারি মেডিকেল কলেজের ছাত্র। সত্যিই, অভাবী মেধাবীদের স্বপ্নপূরণের প্রতিষ্ঠান আল-আমীন মিশন।" ■

সুফি ইরাদা

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৬৭৪৩

এন আর এস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

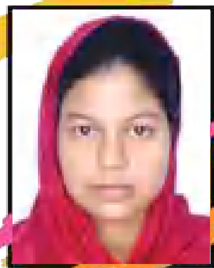

জীবনের ঠিক দিক্‌নির্দেশনা, নিরলস পরিশ্রম এবং স্বপ্নপূরণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলে একজন পড়ুয়া যে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করতে পারে সুফি ইরাদা তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা এই মেধাবী শিক্ষার্থী প্রমাণ করেছে যে, দৃঢ় মনোবল ও অদম্য ইচ্ছেশক্তি থাকলে বড়ো স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব। আল-আমীন মিশন থেকে ২০২৫ সালে যেসব ছাত্র-ছাত্রী এম.বি.বি.এস. পড়ার সুযোগ পেয়েছে তাদেরই একজন সুফি ইরাদা।

সুফি ইরাদার বাড়ি হুগলি জেলার আরামবাগ থানার মান্দ্রা গ্রামে। তাদের নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার। পিতা সেখ ফিরোজ আলি গ্র্যাজুয়েট। ব্যাবসা করেন। মা সুফিয়া বেগমের পড়াশোনা উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত। তিনি একজন গৃহিণী। মাসিক আয় সীমিত হলেও তাঁরা তাঁদের একমাত্র সন্তানের পড়াশোনার প্রতি উদাসীন নন। মেয়েকে কীভাবে লেখাপড়া শিখিয়ে একটা ভালো জায়গায় পৌঁছে দেওয়া যায় সেই চেষ্টা চালিয়েছেন। আরামবাগ গার্লস হাই স্কুল এলাকার নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে অনেক প্রতিযোগিতার বাধা টপকাতে হয়। পড়াশোনার প্রতি যত্নবান হওয়ার কারণেই সুফি ইরাদা সেই স্কুলে ভর্তির সুযোগ পায়।

আরামবাগ গার্লস হাই স্কুল থেকে ২০১৯ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে পেয়েছিল ৬৩৭, অর্থাৎ ৯১ শতাংশ নম্বর। এর পর ইরাদার বাবা-মা বড়ো স্বপ্ন পূরণ করার লক্ষ্যে তাকে আল-আমীন মিশনে ভর্তি করেন। তাঁদের স্বপ্ন ছিল ভবিষ্যতে মেয়েকে ডাক্তার করা। দু-বছর মিশনের খলতপুর শাখায় পড়াশোনা করার পরে ২০২১ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে পায় ৮৮ শতাংশ নম্বর। মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিকের উজ্জ্বল ফল তার ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নের ভিত্তিকে আরও শক্তপোক্ত করে তোলে। কিন্তু, সেই স্বপ্ন সফল করতে যথেষ্ট ধৈর্য আর লড়াকু মানসিকতার পরিচয় দিতে হয়েছে। চার বছরের মাথায় সে সাফল্য পেয়েছে। গতবছর সে নিট পরীক্ষায় ৬০৮ নম্বর পেয়েও স্বপ্ন সফল করতে পারেনি র‍্যাঙ্ক ভালো না হওয়ার জন্যে।

সুফি ইরাদার সবচেয়ে বড়ো অর্জন হল ২০২৫ সালের নিট পরীক্ষায় সাফল্য। প্রায় ২৫ লাখ পরীক্ষার্থীর মধ্যে সে ১৬৭৪৩ র‍্যাঙ্ক করেছে। পেয়েছে ৫৪১ নম্বর। দীর্ঘ চার বছর লড়াই চালিয়ে সে বাবা-মা এবং নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে পারল। তার অর্জিত সাফল্য কেবল তার নয়, তার পরিবার শিক্ষক এবং সমাজের জন্যেও এক গৌরবের বিষয়। সুফি ইরাদার ভবিষ্যতের স্বপ্ন হল একজন হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ হওয়া।

চার বছরের প্রস্তুতির নিরিখে নিটে সাফল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে তার পরামর্শ হল, “বার বার রিভিশন, টাইম মেনটেইন, ইতিবাচক মনোভাব ধরে রেখে পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।”

তার অনুপ্রেরণার উৎস ড. এ পি জে আবদুল কালাম। পাশাপাশি কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলেন প্রিয় বাঙালি। পড়াশোনার বাইরে সুফি ইরাদার শখ বাগান করা। প্রিয় বিষয় পদার্থবিদ্যা। আর খেলাধুলার মধ্যে ক্রিকেট তার প্রিয়।

ভবিষ্যতে সুফি ইরাদা যখন সাদা এপ্রোন গায়ে ডাক্তার হয়ে রোগীর সেবায় নিয়োজিত হবে, তখন তার সংগ্রামের প্রতিটি মুহূর্ত হবে আলোকবর্তিকা, যা প্রতিটি তরুণ-তরুণীকে অনুপ্রাণিত করবে আরও বড়ো স্বপ্ন দেখতে। ■

মহম্মদ সোহেল গাজী

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৬৯৫৮

এন আর এস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

হাবিবুল্লা গাজী ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছেন। এই পড়াশোনা নিয়ে শ্রমনিবিড় কাজ ছাড়া অন্য কিছু করা যায় না। তাই তিনি এমব্রয়ডারির কাজ শিখেছেন। সেই হাতের কাজকে ভিত্তি করে নিজের বাড়িতেই কাজ করেন। মার্কেট থেকে কাজ আনেন। দু-এক জন কর্মীকে নিয়ে সেই কাজ করে আবার জমা দেন। যে-মজুরি মেলে তা দিয়ে সংসার চালান। তাঁর স্ত্রী সানোয়ারা বিবির পড়াশোনাও ক্লাস এইট পর্যন্ত। এই দম্পতির তিন সন্তান। মহম্মদ সোহেল গাজী, সাবিলা খাতুন আর সাকিবুল গাজী। আমরা কথা বলছি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উস্থি থানার উত্তর কুসুম গ্রামের একটা পরিবারকে নিয়ে। কথা বলার কারণ এই পরিবারের বড়োসন্তান সোহেল গাজী ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছে। ২০২৫ সালের নিট পরীক্ষায় সফল হয়ে সে এম.বি.বি.এস. পড়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

সোহেলের ডাক্তার হওয়ার যাত্রা শুরু হয়েছিল আল-আমীন মিশনে ভর্তি হওয়ার মধ্যে দিয়ে। সে মিশনে পড়েছে ক্লাস ইলেভেন থেকে। মিশনে ভর্তি হওয়ার বিষয়ে তাকে অনুপ্রাণিত করেছেন তার কাকা আলাউদ্দিন গাজী। তিনি আল-আমীন মিশনের ছাত্র ছিলেন। তিনি ভেটেরিনারি ডাক্তার হয়েছেন। সোহেল গ্রামের সরকারি হাই স্কুল থেকে ২০২১ সালে ৮৮.৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাস করার পরে মিশনের বজবজ শাখায় ভর্তি হয়। পরিবারের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে মিশন তাকে খুবই কম, পাঁচ ভাগের এক ভাগ বেতনে পড়ার সুযোগ দিয়েছে। ২০২৩ সালে উচ্চ-মাধ্যমিকে সোহেল পায় ৮৭ শতাংশ নম্বর। এরপর দু-বছর তাকে নিটের কোচিং নিতে হয়েছে। গতবছর সে নিট পরীক্ষায় পেয়েছিল ৫৫২ নম্বর। র‍্যাঙ্ক হয়েছিল এক লাখ তিরিশ হাজারের মতো। এ-বছর পরীক্ষা অনেক কঠিন হয়েছে, তাই কম নম্বর পেয়েও র‍্যাঙ্ক ভালো এসেছে ছাত্র-ছাত্রীদের। ৫৪১ নম্বর পেয়ে এ-বার সোহেলের র‍্যাঙ্ক হয়েছে ১৬৯৫৮।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাশাপাশি সোহেল প্রযুক্তি ক্ষেত্রের প্রতি উৎসাহী। সেই উৎসাহ থেকেই বসেছিল জেইই মেইন পরীক্ষায়। ৯৪ শতাংশ পার্সেন্টাইল পেয়েছে। ভবিষ্যতে সে বহুমুখী দক্ষতা অর্জন করে একদিকে ডাক্তার হিসেবে, অন্য দিকে প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও দক্ষতা অর্জন করতে চায়। নিট-পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশে তার পরামর্শ— "যদি নিট ক্র্যাক করতে চাও, তবে পড়াশোনার পাশাপাশি আধ্যাত্মিকভাবে ও মানসিকভাবে একজন ভালো মানুষ হওয়া জরুরি।"

সোহেলের স্বপ্ন শুধু এম.বি.বি.এস. পাস করে ডাক্তার হওয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়। সে উচ্চশিক্ষা নিয়ে এম.ডি. বা এম.এস. করতে চায় এবং দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্যে কাজ করতে চায়। তাঁর মতে, একজন ডাক্তার শুধু রোগ সারায় না, সমাজের ভরসা হয়ে ওঠে।

আল-আমীন মিশনে ভর্তি হওয়ার পরে সোহেল উপলব্ধি করেছে যে, এটি কেবল একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, বরং আদর্শ মানুষ গড়ার ঠিকানা। এখানে শিক্ষার্থীদের কেবল বই মুখস্থ করানো হয় না, বরং মানসিক দৃঢ়তা নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধও শেখানো হয়। তার এই মূল্যবান উপলব্ধি আরও স্পষ্ট হয় যখন সে জানায়— "আমি একজন ভালো ডাক্তার হব, মানুষের সেবা করব, সমাজ ও দেশের উন্নতির জন্যে আমার জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগাব। আল-আমীন মিশনের নাম আরও উজ্জ্বল করাই আমার লক্ষ্য।" ■

ইসমাত ফরজানা খানম

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৭৫৮০

ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

ইফতিখার ও ইন্তেজামুল দু-জনই এম.বি.বি.এস. পাস করেছেন। মনিমা বি.এসসি. নার্সিং পড়ছেন। মোস্তাজারুল এ-বছরের নিটে সাফল্য পেয়েছে। নারজীস একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে পাঠরত ছাত্রী। ইসমাত ফরজানা খানম নিজেও এ-বছর নিটে ৫৪০ নম্বর পেয়ে এম.বি.বি.এস. পড়ার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে। এদের প্রথম পরিচয় এরা সকলেই একই পরিবারের ছয় ভাই-বোন। তাদের আরও এক সাধারণ পরিচয় তারা সকলেই আল-আমীন মিশনের পড়ুয়া। অগ্রজ ইফতিখার থেকে কনিষ্ঠ নারজীস ছয় ভাই-বোন যথাক্রমে মিশনের নয়াবাজ, খলিশানি, উলুবেড়িয়া (বিউটি), উলুবেড়িয়া (মরিয়ম), অঙ্কুরহাটি ও গঙ্গারামপুর শাখায় পড়েছে ও পড়ছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ঢোলাহাট থানার কোজাবেড়িয়া গ্রামের শিক্ষক ইদ্রিশ আলি খান গণিতে স্নাতকোত্তর। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। মাধ্যমিক পাস তাঁর স্ত্রী মানজুলা খানম গৃহবধূ। শিক্ষকতা ও বেশ কয়েক বিঘা কৃষিজমির আয়ে চলে সংসার। মধ্যবিত্ত পরিবারে সন্তানদের শিক্ষা বিষয়ে প্রথম থেকেই যত্নবান ছিলেন তাঁরা। সে-কারণে সরকারি বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি শিক্ষালয়ে হস্টেলে রেখে ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা করিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছেন।

সরকারি প্রাইমারি ও কোয়াবেড়িয়া মোহাম্মাদিয়া হাই মাদ্রাসায় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার পরে ইসমাত নবম শ্রেণিতে একটি আবাসিক মিশনে ভর্তি হয়। ওই প্রতিষ্ঠান থেকে মাধ্যমিকে ৮৯.৫ শতাংশ এবং অন্য আরেক আবাসিক প্রতিষ্ঠান থেকে ২০২২-এ উচ্চ-মাধ্যমিকে ৮৯.৬ শতাংশ নম্বর পায়। রানিং ইয়ারে নিটে ইসমাত প্রায় দু-শোর বেশি নম্বর পায়। পরের বছর ২০২৩-এ স্থানীয় এক মেসে থেকে সেলফ স্টাডি করেও সেভাবে নম্বর পায়নি। এই রেজাল্টে আশাহত হলেও নতুন উদ্যমে কলকাতার এক আবাসিক কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয় ইসমাত। দিনরাত পরিশ্রমের ফলে ২০২৪ সালে সন্তোষজনক ৬০৮ নম্বর পায়, যদিও এম.বি.বি.এস. পড়ার স্বপ্ন পূরণ হয় না।

ইসমাত জানায়, “গতবছর নিটের ফল জানার পরে অনেকটা দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। খুব কষ্ট হয়েছিল। মনে হয়েছিল আর নিট দেব না। কিন্তু, আল-আমীন মিশনে এসে অনেকটা সাহস পাই। দৃঢ়চিত্ত হই যে, যেভাবেই হোক নিট ক্লিয়ার করতেই হবে। মিশনের অঙ্কুরহাটি শাখা পড়াশোনার জন্যে আদর্শ জায়গা। স্যারদের নোটস পড়ে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করেছি। ডাউট ক্লিয়ারিঙের জন্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকেরা আমার সাফল্যের ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা রেখেছেন। অঙ্কুরহাটির ইনচার্জ স্যার, ম্যামও অনেক সাহায্য করেছেন। এ ছাড়া এই সাফল্যে আমার বাবার পরিশ্রম, মায়ের ভালোবাসা, দাদা-দিদির পাশে থাকাও মোটিভেশন হিসেবে কাজ করেছে।” ইসমাতের ইচ্ছে ভবিষ্যতে একজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ হয়ে বাচ্চাদের চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করা। পাশাপাশি দুঃস্থ ও অসহায় পরিবারের চিকিৎসায় সহায়তার হাত প্রসারিত করা। তার মতে নিটে সাফল্য পেতে হলে পড়াশোনার পরিশ্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, নিজের দুর্বল জায়গাগুলো চিহ্নিত করে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করা, বার বার রিভিশন করা, মিস্টেক নোটস তৈরি করা জরুরি। ভ্রমণ ও ফুটবল খেলা দেখা পছন্দ তার। প্রিয় বিষয় ফিজিক্স এবং প্রিয় ভারতীয় ও বাঙালি যথাক্রমে এ পি জে আবদুল কালাম ও রাজা রামমোহন রায়। ■

রাফিনা খাতুন

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৭৬০১

ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

মাধ্যমিক পর্যন্ত সময় পেলেই গল্পের বই পড়তে লেগে যেত। অবসরে মাঝেসাঝে দেখতে বসত ক্রিকেট খেলা। ক্লাস ইলেভেনে সায়েন্স নিয়ে পড়ার চাপ এবং পরে নিটের প্রস্তুতিতে সেগুলো বাদ পড়ে যায়। এরই মাঝে ফিজিক্স হয়ে ওঠে প্রিয় বিষয়। রতন নাভাল টাটা তার অন্যতম প্রিয় ভারতীয় ব্যক্তিত্ব, কারণ, শিল্পপতি হওয়ার সঙ্গে উচ্চশিক্ষার প্রসার ও লোকহিতকর্মে তিনি অতুলনীয় অবদান রেখেছেন। পাশাপাশি তার খুবই পছন্দের বাঙালি ব্যক্তিত্ব শিক্ষাদ্যোগী এম নুরুল ইসলাম, কারণ, তিনি না থাকলে আল-আমীন মিশন হত না। আর এই প্রতিষ্ঠান না থাকলে গ্রামীণ কৃষক ও কারিগর প্রভৃতি প্রান্তিক পরিবারের ছেলে-মেয়েরা তার মতো ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেত না। এভাবেই নিজের শখ ও পছন্দসই গুণীজনের কথা জানাল মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার আইড়মারি গ্রামের রাফিনা খাতুন। নিটে ৫৪০ নম্বর পেয়ে সে এম.বি.বি.এস. পড়ুয়া হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

রাফিনার বাবা রাফিকুল ইসলাম একজন কৃষক। তিনি পাটজাত দ্রব্যের ব্যাবসাও করেন। তাঁর পড়াশোনা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। নবম শ্রেণি পাস মা আয়েশা বিবি ঘরের পরিচালক। রাফিনার তিন দাদার মধ্যে বড়ো ও মেজো মনিরুল ও কিরণ যথাক্রমে ফার্মাসিস্ট ও এম.বি.বি.এস. পাস-করা চিকিৎসক এবং ছোটো লিটন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পাঠরত। রাফিনা ২০২০ সালে ডিহিপাড়া খাদেম আলি মেমোরিয়াল হাই স্কুল থেকে ৭২ শতাংশ এবং ২০২২-এ কুমারপুর বি এন এম হাই স্কুল থেকে ৯০ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। রাফিনা জানায়, তাদের এলাকায় প্রায় ২০ জনের মতো ছেলে-মেয়ে এম.বি.বি.এস. পাস করেছে কিংবা পড়ছে। এই তালিকার অধিকাংশই আল-আমীন মিশনের প্রাক্তনী। এ ছাড়া তার দাদা এম.বি.বি.এস. চিকিৎসক হয়ে আব্বা-মাকে খুশি করায় তারও ইচ্ছে জাগে ডাক্তার হয়ে আব্বা-মায়ের মন ভরিয়ে দিতে। সে-কারণে নিটের কোচিঙে তার প্রথম পছন্দই আল-আমীন মিশন।

উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার বছর নিট পরীক্ষায় রাফিনা পায় ৭০ নম্বর। আব্বা-মা ও দাদাদের সিদ্ধান্তে রাফিনা পৌঁছে যায় মিশনের বারুইপুর ক্যাম্পাসে। হস্টেলে পরিকল্পনামাফিক ক্লাস করা, সব ধরনের টেস্টে অংশগ্রহণ ও সেল্ফ স্টাডিতেও হয়ে ওঠে মগ্ন। এভাবেই ২০২৩ ও ২০২৪-এ নিটে রাফিনার প্রাপ্ত নম্বর হয় যথাক্রমে ৩৪৯ ও ৫৭৩। পর পর দু-বছরের হতাশা কাটিয়ে রাফিনা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় ২০২৫-এ আব্বা-মায়ের মুখে হাসি ফোটাবেই। নিটের রেজাল্ট প্রকাশের দিন রাফিনার তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে যায়। দাদা ডেকে সাফিনাকে জানালেন, সে ৫৪০ নম্বর পেয়েছে। পাশেই তার মা ও অন্যরা ছিলেন। সকলেরই চোখে আনন্দাশ্রু। মুহূর্তেই চারিদিকে চাউর হয়ে গেল রাফিকুল সাহেবের মেয়ে ডাক্তারি পড়ার পরীক্ষায় পাস করেছে।

এম.বি.বি.এস. কোর্স শেষ করার পরে রাফিনা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ হতে আগ্রহী। কারণ, গ্রামীণ জনপদের শিশুরা সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত। সে দেখছে গ্রামাঞ্চলের দুঃস্থ মানুষেরা পয়সার অভাবে কীভাবে চিকিৎসার পরিষেবা থেকে দূরে রয়ে যায়। তার ইচ্ছে এঁদের পাশেও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। রাফিনার মতে নিট ক্র্যাক করতে হলে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজির প্রত্যেক অনুচ্ছেদ ভালোভাবে বুঝতে পারা, নিজের আত্মবিশ্বাস বজায় রাখা, ধারাবাহিক কঠোর পরিশ্রম এবং অবশ্যই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ জরুরি। ■

সুমি হাসান

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৭৭৭১

আর জি কর মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

সুমি হাসান নদীয়া জেলার ধুবুলিয়া থানার সোনাতলা নামক এক সাধারণ গ্রাম থেকে উঠে আসা মেধাবী ছাত্রী। তার বাবা হোসেন আলি মণ্ডল একজন আরএমপি চিকিৎসক। মা মেরিনা তাসনিম আহমেদ বি.এ. পাস। তিনি একজন গৃহিণী। বাবার সীমিত উপার্জন দিয়ে সংসার চালিয়ে নিয়ে যাওয়া খানিকটা সহজই ছিল, যদি না তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হতেন। পিতার পাশাপাশি মাও প্রায়ই নানা রোগে অসুস্থ থাকেন। তাই বাবা-মায়ের সামনে একমাত্র আশার আলো তাঁদের দুই কন্যা সুমি ও তার দিদি হাইমে হাসান। সীমিত উপার্জন-সহ নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তাঁদের দুই কন্যার পড়াশোনার বিষয়ে অযত্ন করেননি বাবা-মা। হাইমে হাসান এম.এসসি. পাস। বি.এড.-ও করেছেন। তিনি আল-আমীন মিশনেই শিক্ষকতা করেন। এক অর্থে দিদি হলেন সুমির অভিভাবক।

সুমি আল-আমীনের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে আল-আমীন মিশনে পড়ার সুযোগ পায়। সে মিশনে পড়েছে ক্লাস এইট থেকে। পড়ত রানিহাটি শাখায়। এই শাখা থেকে পরীক্ষায় বসে ২০২১ সালের মাধ্যমিকে সে পায় ৬৬০ নম্বর। ৯৪.২ শতাংশ নম্বর। এর পর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি পড়েছে উলুবেড়িয়ার বিউটি ভবন শাখায়। ২০২৩ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পায় ৮৬.২ শতাংশ নম্বর। গতবছর সুমি নিটে পেয়েছিল ৬২২ নম্বর, র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ৫২৮১৫। মাত্র কয়েক নম্বরের জন্যে স্বপ্ন পূরণ না হলে হতাশায় ভেঙে পড়ে অনেকেই। কিন্তু, সুমি হতাশ না হয়ে নতুন করে আবার পড়াশোনা শুরু করে। নিজের ভুল-ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে তা ঠিক করে নেওয়ার লক্ষ্যে আরও বেশি পরিশ্রম করা শুরু করে। সুমি ২০২৫ সালের নিট পরীক্ষায় ১৭৭৭১ র‍্যাঙ্ক করেছে। সে নিট পরীক্ষায় ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৫৩৯ নম্বর পেয়ে এই র‍্যাঙ্ক অর্জন করেছে।

সাফল্য লাভের পরে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে সুমি জানিয়েছে, "আমি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। আমার বাবা হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত এবং মা অসুস্থ। আমার দিদি মিশনের উলুবেড়িয়া শাখায় রুম-টিচার হিসেবে থাকেন। আমার দিদি মূলত আমার অভিভাবক হিসেবে দেখাশোনা করেছেন ছোটো থেকেই। আর্থিক টানাপোড়েন থাকলেও, মিশন কর্তৃপক্ষের সাহায্য পেয়ে এগিয়ে যেতে প্রেরণা পেয়েছি। ব্রাঞ্চ ইনচার্জ মহাশয় অনেক মোটিভেট করেছেন। লকডাউনের জন্যে আমাদের ব্যাচের মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়নি, ভেবেছিলাম উচ্চ-মাধ্যমিক ভালো করে দেব, এবং তার জন্যে অনেক পরিশ্রম করেছিলাম। তবে তেমন ভালো ফল হয়নি। প্রথম বছর কোচিঙের পরে ৬২২ পেয়েছিলাম, এম.বি.বি.এস.-এ চান্স হয়নি। মিশনের সহায়তায় দ্বিতীয় বার বসে ৫৩৯ নম্বর পেয়েছি। ডাক্তারি পড়ার স্বপ্ন পূরণ হওয়ায় খুবই খুশি হয়েছি।"

সুমি হাসান নিটের প্রস্তুতি বিষয়ে পরামর্শ দিতে গিয়ে জানিয়েছে, "প্রতিটি চ্যাপ্টার ধরে শর্ট নোট তৈরি করে সেটাকে বার বার রিভাইজ করলে উপকারে আসবে।"

সুমির ভবিষ্যতের স্বপ্ন রেডিয়োলজিস্ট হওয়া। সুমি শুধু পড়াশোনাতেই নয়, সৃজনশীল কাজেও মনোযোগী। তার প্রিয় ব্যক্তিত্ব এ পি জে আবদুল কালাম। কারণ, আবদুল কালাম সুমির মতো পড়ুয়াদের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন। সুমি বিশ্বাস করে স্বপ্ন দেখা এবং তার জন্যে নিরলস পরিশ্রম করা জীবনে সাফল্যের একমাত্র উপায়। ■

ইলহাম মানসিজ

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৮১১৪

আর জি কর মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

বাবা মহম্মদ পিয়ারুল ইসলাম বি.এ. পাস করে জীবিকা নির্বাহের জন্যে একটি জেরক্স দোকান চালান। মাধ্যমিক পাস মা হোসেনারা খাতুন একজন আইসিডিএস-কর্মী। দু-জনের সম্মিলিত উপার্জনে সংসারটা চলে যায়। এই দম্পতির একমাত্র সন্তান ইলহাম মানসিজ। নিম্নবিত্ত সাধারণ পরিবার। পিতা-মাতার স্বপ্ন ছিল ছেলেকে ডাক্তার করবেন। সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে দীর্ঘ লড়াইয়ের শেষে। তাঁদের সন্তান ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছে।

কথা হচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলার ইসলামপুর থানার গোয়াস গ্রামের ইলহাম মানসিজকে নিয়ে। সে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হয় আল-আমীন মিশনে। মিশনের শৃঙ্খলা, বন্ধুদের সঙ্গে সুস্থ প্রতিযোগিতা আর পড়াশোনার পরিবেশ ইলহামের পড়াশোনার মান বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ২০২০ সালে মাধ্যমিকে সে পায় ৯২.৫৭ শতাংশ নম্বর আর এর ঠিক দু-বছর পরে, ২০২২ সালে উচ্চ-মাধ্যমিকে আরও উজ্জ্বল ফল করে, পায় ৯৫ শতাংশ নম্বর। এই সাফল্য শুধু পরিবারের নয়, এলাকারও গর্ব হয়ে উঠল। এর পর ইলহাম লড়াইয়ে নামল নিজের ও বাবা-মায়ের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে। সেই লক্ষ্য হল নিট (ইউজি) পরীক্ষায় সফল হয়ে এম.বি.বি.এস. পড়ার সুযোগ অর্জন করা। কিন্তু, খুব সহজে তার নাগাল পেল না। হতাশা পাশে সরিয়ে তিন বছরের

জীবনে বড়ো কিছু করতে চাইলে স্বপ্ন দেখতে হয়, এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তব করতে চাইলে লাগে একাগ্রতা, পরিশ্রম আর ধৈর্য। ইলহাম মানসিজের সফল হওয়ার গল্প সেই স্বপ্নপূরণের অনন্য দৃষ্টান্ত।

কঠোর পরিশ্রম আর এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে তাকে শেষ পর্যন্ত জিতিয়ে দিয়েছে। ২০২৫ সালের নিট (ইউজি) পরীক্ষায় সে ৫৩৯ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় স্তরে ১৮১১৪ র‍্যাঙ্ক অর্জন করেছে। সরকারি মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছে সে। মিশন সর্বোচ্চ কার্যকরী দিক্‌নির্দেশনা নিয়ে পাশে না থাকলে সাফল্য পাওয়া সম্ভব হত না বলে জানিয়েছে সে। আর নিট-পরীক্ষার্থীদের জন্যে সে তিনটে পরামর্শ দিয়েছে, “হার্ড ওয়ার্ক, মোর প্র্যাকটিশ অ্যান্ড মোর মকটেস্ট— এই তিন সূত্র মেনে চললে সফল হওয়া সহজ হয়ে যাবে।” ভবিষ্যতে সে কার্ডিয়োলজিস্ট হতে চায়। কারণ জানতে চাইলে জানায়, “আমার কাকু হার্টের রোগে মারা গিয়েছেন। তিনি বলে গিয়েছেন ভালো ডাক্তার হতে হবে। ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। কাকু যে-রোগে মারা গিয়েছেন সে-রোগের রোগীদের চিকিৎসা করতে পারলে আমার ভালো লাগবে।”

মা-বাবা, কাকু সবার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে ইলহামের হাত ধরে। জীবনে বড়ো কিছু করতে চাইলে স্বপ্ন দেখতে হয়, এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তব করতে চাইলে লাগে একাগ্রতা, পরিশ্রম আর ধৈর্য। ইলহাম মানসিজের সফল হওয়ার গল্প সেই স্বপ্নপূরণের অনন্য দৃষ্টান্ত। ■

সানিয়া ইসলাম

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৯০৬৫

কলেজ অব মেডিসিন অ্যান্ড সাগর দত্ত হসপিটাল

সানিয়া ইসলাম পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার অনন্তপুর গ্রামের মেয়ে। রাজধানী শহর কলকাতা থেকে দূরের এক জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে এসে নিজের স্বপ্নকে বড়ো করে দেখার সাহসই তাকে আলাদা করেছে। উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করা তার বাবা সেখ সাকেরুল ইসলাম একজন রাজমিস্ত্রি। কঠোর পরিশ্রম করে তিনি পরিবারের সদস্যদের কেবল অন্ন-বস্ত্র জুগিয়ে থেমে থাকেননি। সন্তানদের শিক্ষার প্রতিও তিনি খুবই যত্নশীল। মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করা মা মুক্তা বিবি একজন গৃহবধূ। তিনি সংসারের কাজ সামলিয়ে মেয়েদের পড়াশোনায় সবসময় পাশে থেকেছেন।

শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই সানিয়া ছিল মনোযোগী ও মেধাবী ছাত্রী। পড়াশোনার প্রতি তার ঝোঁক দেখে সাকেরুল সাহেব মেয়েকে ক্লাস সিক্সে আল-আমীন মিশনে ভর্তি করেন। পড়ত খলতপুর শাখায়। ২০২২ সালে মাধ্যমিকে সানিয়া পায় ৯৪ শতাংশ নম্বর। এর পর সাঁতরাগাছি শাখা থেকে পড়াশোনা করে ২০২৪ সালে বসে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায়। পায় ৯২ শতাংশ নম্বর। আল-আমীন মিশনে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত যে একেবারে ঠিক ছিল তা সানিয়ার রেজাল্ট দেখে স্পষ্ট হয়ে যায়। সানিয়ার ধারাবাহিক সাফল্য কেবল পরিবারের নয়, সমগ্র এলাকার গর্ব হয়ে ওঠে।

এরপর শুরু হয় নতুন দৌড়। সানিয়া আল-আমীনের সান্নিধ্যে এসে নিজের জীবনের স্বপ্নের পরিধি ঠিক করার দিশাও পেয়ে যায়। সে স্থির করে নেয় ডাক্তার হবে। তার জন্যে প্রয়োজন নিট পরীক্ষায় পাস করা। সেই পরীক্ষার গণ্ডি টপকাতে দরকার স্পেশাল কোচিং নেওয়ার। আল-আমীন মিশন নিট কোচিং দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান। তাই মিশনেই কোচিং নেওয়া শুরু করে সানিয়া। নেয় অঙ্কুরহাটি শাখায়। মাত্র এক বছরের কোচিঙেই সে পৌঁছে যায় নিজের স্বপ্নের দুয়ারে। ২০২৫ সালের নিট পরীক্ষায় সে পেয়েছে ৫৩৭ নম্বর। ১৯০৬৫ র‍্যাঙ্ক করে সে ডাক্তারি পড়ার ছাড়পত্র পেয়েছে। সানিয়ার এই সাফল্যে পরিবারে তো বটেই এলাকাতেও একটা হইচই পড়ে গেছে। সানিয়ার কথায়, "আমার মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক ও নিটের ফল দেখে এখন এলাকার সবাই তাঁদের সন্তানদের মিশনে ভর্তি করতে চাইছেন।" এভাবে বিভিন্ন এলাকার এক-একটা সানিয়ার সাফল্য শত শত সানিয়াকে স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করছে। আর সেই স্বপ্ন সফল করতে আল-আমীন মিশন চার দশকজুড়ে আহ্বান জানিয়ে চলেছে স্বপ্নভুক ছেলে-মেয়েদের।

সানিয়ার ভবিষ্যতের স্বপ্ন একজন কার্ডিয়োলজিস্ট হওয়া। তার সবচেয়ে প্রিয় বিষয় পদার্থবিজ্ঞান। অবসর সময়ে সে গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে। নিট পরীক্ষায় সফল হওয়ার ক্ষেত্রে তার পরামর্শ হল, "বায়োলজি রোজ পড়তে হবে। কেমিস্ট্রি, ফিজিক্সের জন্যে এনসিইআরটি-র বই পড়লে খুব ভালো হয়। দু-তিন জনের গ্রুপ স্টাডি বা কম্পিটিশন করে পড়লে পড়ার গতি আসবে।" সানিয়া বিশ্বাস করে—কোনো বড়ো লক্ষ্য অর্জন করতে হলে নিয়মিত পরিশ্রমের বিকল্প নেই।

সানিয়া ইসলামের সাফল্য প্রমাণ করে, গ্রামীণ প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসা একটি মেয়ে, বাড়ির বা এলাকার পরিবেশ যেমনই হোক-না-কেন, যদি স্বপ্ন দেখে এবং সেই স্বপ্ন পূরণের জন্যে পরিশ্রম করে, আর আল-আমীন মিশনের মতো প্রতিষ্ঠানকে পাশে পায়, তাহলে স্বপ্ন পূরণ হবেই হবে। ■

বুশরা খাতুন

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২২৪১৯

ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

"২০১৭ সালে আমার মা ক্যান্সার আক্রান্ত হন। টানা দু-বছর চিকিৎসা চলার পরে ২০১৯-এ ইন্তেকাল করেন। তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। মায়ের ইচ্ছে ছিল, আমি যেন ডাক্তার হই। আমার আব্বার কঠোর পরিশ্রমে এবং মিশনের উন্নত পড়াশোনার প্রক্রিয়ায় মায়ের সেই ইচ্ছেই সাকার হতে চলেছে।"— ফোনে কথাগুলো বলার সময় গলার স্বর বলছিল বুশরা কাঁদছে। যতই হোক জন্মদাত্রী আয়েশা সিদ্দিকা তাঁর মেয়ের সাফল্য উদ্‌যাপনে অনুপস্থিত। মহ. বরকতউল্লাহ্ যদিও আব্বার সঙ্গে মায়েরও স্নেহ-ভালোবাসায় ভরিয়ে রেখেছেন দুই কন্যা ও এক পুত্রকে। অন্য দু-জন যথাক্রমে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়া।

বীরভূমের মুরারই থানার খানপুর গ্রামের স্নাতক মহ. বরকতউল্লাহ্ নিজেদের বিঘে পাঁচেক জমিতে কৃষিকাজেই সংসার নির্বাহ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ের লেখাপড়ায় উৎসাহব্যঞ্জক ফল করত বুশরা। সেই সূত্রে তাকে আল-আমীনে পড়াবার ইচ্ছে আব্বা-মায়ের। মিশনের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে সে পাসও করে। অনিয়মিত অসংগঠিত কৃষিকাজের সামান্য আয়ের মাধ্যমে মিশনের খরচ সামলানো যাবে কি না, এই নিয়ে চিন্তিত হয় পরিবার। শেষমেষ মাসিক বেতন ও ভর্তিতে আর্থিক ছাড় পেয়ে বুশরা মিশন পরিবারে প্রবেশ করে। নিজেদের জেলার পাথরচাপুড়ি ক্যাম্পাসে ক্লাস ফাইভে বুশরা শুরু করে তার পড়াশোনার অভিযান। প্রথম প্রথম একটু-আধটু মনখারাপ করলেও নতুন বন্ধুদের সঙ্গো হস্টেলজীবনে লেখাপড়ায় ডুবে যায়। এরই মাঝে ঘটে যায় চরম দুঃখজনক মাতৃবিয়োগ। ২০২১-এ মাধ্যমিকে ৯৭ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে ইলেভেনে পড়তে চলে আসে মিশনের সাঁতরাগাছি শাখায়। ২০২৩-এ এখান থেকেই উচ্চ-মাধ্যমিকে প্রায় ৮৮ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাস করে।

খুব নির্দিষ্ট করে নয়, তবে বুশরার হালকা ইচ্ছে ছিল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। পাশে ছিল তার মায়ের স্বপ্নও। ২০২৩-এ রানিং ইয়ারে নিটে সে পেয়েছিল প্রায় ৩৬০ নম্বর। এরপর নিটের প্রস্তুতি নিয়ে পৌঁছোয় অঙ্কুরহাটি শাখায়। ২০২৪-এ কঠোর পরিশ্রম করেও তার সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক হয় ১ লাখের ওপরে। প্রাপ্ত নম্বর ৫৩৬। পরিহাসের কথা— ২০২৫-এ তার প্রাপ্ত নম্বর ২০২৪-এর থেকে ৪ নম্বর কম, অর্থাৎ ৫৩২। নম্বর কম পেলেও র‍্যাঙ্ক বাড়েনি, অবিশ্বাস্যভাবে কমে তার সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক হয় ২২৪১৯। এই র‍্যাঙ্কে ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে বুশরা। হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত খানপুর গ্রামের বুশরাই প্রথম পড়ুয়া যে সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেল।

তার ইচ্ছে এম.বি.বি.এস. কোর্স সম্পূর্ণ হওয়ার পরে কার্ডিয়োলজি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নেওয়া। তার আরও এক বড়ো ইচ্ছে গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করা। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, আব্বার উৎসাহ, মিশনের সেক্রেটারি স্যারের দোয়া, অঙ্কুরহাটি শাখার কিবরীয়া স্যার ও জুলেখা ম্যাডামের ব্যবস্থাপনা ও বন্ধুদের সহযোগিতা তার সাফল্যের কারণ বলে জানায় বুশরা। তার মতে নিটে সাফল্যের জন্যে প্রথম থেকেই এনসিইআরটি-র বই খুঁটিয়ে পড়া, ফিজিক্সের প্রত্যেক অধ্যায়ের কনসেপ্ট ক্লিয়ার রাখা, একবার ভুল হলেও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দ্বিতীয় বারেই সেটিকে আত্মস্থ করা। বার বার রিভিশন করা, বেশি বেশি মকটেস্ট দেওয়া এবং সর্বোপরি নিট পরীক্ষার সময় মাথা ধীর-স্থির রাখাও জরুরি। ■

মহম্মদ সাকিব মোমিন

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২৩৫২৪

ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

শিক্ষা একটি শক্তিশালী অস্ত্র, যা মানুষের জীবনকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। মালদা জেলার কালিয়াচক থানার রান্নুচক গ্রামের মহম্মদ সাকিব মোমিন এবং তার পরিবার একটি আদর্শ উদাহরণ।

মহম্মদ সাকিব মোমিনের পরিবার পাঁচ সদস্যের। বাবা-মা আর তিন ভাই-বোন। পিতা মহম্মদ সাজ্জাদ মোমিন ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। তিনি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ছোট্ট ব্যাবসা চালিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ করেন। আর তার মা সেলিনা খাতুন উচ্চ-মাধ্যমিক পাস। তিনি একজন গৃহিণী হিসেবে পরিবারের হাল শক্ত হাতে ধরে রেখে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এই পরিবারের আসল শক্তি লুকিয়ে আছে সন্তানদের শিক্ষার বিষয়ে গভীর যত্ন নেওয়ার ভেতরে। মহম্মদ সাকিবের দিদি শাহানা পারভীন, বি.এসসি. নার্সিং পাস করেছেন। তাঁকে আবাসিক মিশনে পড়াশোনা করিয়েছেন তাঁর বাবা-মা। পড়েছেন আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখায়। সাকিব মোমিন মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছে মালদার একটি আবাসিক মিশনে। মাধ্যমিকের পরে এসেছে আল-আমীন মিশনে। সাকিবের ভাই মহম্মদ সহিমউদ্দিন মোমিন পড়ছে ক্লাস নাইনে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এই পরিবার কেবল শিক্ষাকে হাতিয়ার করেই জীবন বদলের লড়াইয়ে সামিল হয়েছে। শিক্ষা হয়ে উঠেছে তাদের স্বপ্নের সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়ে গোটা পরিবার পৌঁছে যাচ্ছে নতুন দিগন্তে। মোমিনের দিদি নার্স হয়ে অর্থকরী কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় আর্থিক সমৃদ্ধির দ্বার খুলে গেছে। ভবিষ্যতে তাঁর চেয়ে আরও কয়েক গুণ বেশি উপার্জন করবে সাকিব মোমিন, কারণ সে ডাক্তার হতে চলেছে। এ-বছরের নিট পরীক্ষায় সে ৫৩১ নম্বর পেয়েছে। সর্বভারতীয় স্তরে তার র‍্যাঙ্ক হয়েছে ২৩৫২৪। সাকিবের এই র‍্যাঙ্কের গুরুত্ব বাকি অনেক পড়ুয়ার থেকে কয়েক গুণ বেশি। কেননা, সে রানিঙে এই র‍্যাঙ্ক করেছে। অর্থাৎ, কোনো ইয়ার লস না করেই ডাক্তারি পড়ার সুযোগ ছিনিয়ে নিয়েছে।

> **২০২৫ সালের উচ্চ-মাধ্যমিকেও মোমিন দুর্দান্ত রেজাল্ট করেছে। পেয়েছে ৯০.৪ শতাংশ নম্বর। সে ভবিষ্যতে একজন নিউরো সার্জন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।**

সাকিব মোমিন আল-আমীন মিশনে পড়েছে ক্লাস ইলেভেন থেকে। পড়ত হাওড়ার নয়াবাজ শাখায়। ২০২৫ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও সে দুর্দান্ত রেজাল্ট করেছে। পেয়েছে ৯০.৪ শতাংশ নম্বর। মোমিন ভবিষ্যতে একজন নিউরো সার্জন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। মোমিনের প্রিয় বিষয় পদার্থবিদ্যা। ক্রিকেট তার অত্যন্ত প্রিয় খেলা। সাকিব মোমিন নিট পরীক্ষায় ভালো প্রস্তুতির জন্যে উত্তমরূপে এনসিইআরটি-র বই পড়া আর ক্যাম্পাসে শিক্ষকের গাইডেন্স মেনে চলার কথা বলেছে। এই নিয়ম মেনেই সে সাফল্য কায়েম করতে পেরেছে। ■

শাহনওয়াজ পারভীন

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২৩৬১৩

বারাসাত গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

শাহনওয়াজ পারভীনের আব্বা নুরুল ইসলাম সরদার ওষুধের ছোটো দোকানদার। স্থানীয় মানুষজনের সর্দি-কাশি-জ্বরজ্বালায় সাময়িক কিছু ওষুধপত্রও দিয়ে থাকেন। প্রথম থেকেই তাঁর ভাবনা ছিল সন্তানকে চিকিৎসক করবেন। প্রথম সন্তান শাহনওয়াজের লেখাপড়ায় ছোটোবেলা থেকেই যত্ন নিয়েছেন। তার প্রাথমিক স্তরের পড়াশোনা স্থানীয় নার্সারি স্কুলে। মেধাবী শাহনওয়াজ জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করে। ২০২০ ও ২০২২ সালে সিবিএসই দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় সে যথাক্রমে ৯৩.৬ ও ৮৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করে। ওই বছর নিটে তার প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৩১১। পরের বছর ২০২৩ সালে বাড়িতে থেকে অনলাইনে কলকাতার এক সংস্থার ক্লাসের মাধ্যমে নিটের প্রস্তুতি নেয়। নিটে ৩৯২ নম্বর পাওয়া পরীক্ষার্থী ও অভিভাবক কারো মন ভরে না।

শাহনওয়াজের আব্বা ও মা উভয়েই দুশ্চিন্তায় পড়েন। সময়কালে এক বাংলা পত্রিকায় আল-আমীন মিশনের নিট কোচিঙের প্রবেশিকা পরীক্ষার বিজ্ঞাপন দেখেন। সঙ্গে ছিল প্রতিষ্ঠানের বিগত বছরগুলির সাফল্যের পরিসংখ্যান। এই সূত্রে শাহনওয়াজকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসাবার মনস্থির করে ফেলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে শাহনওয়াজ মিশনের উলুবেড়িয়া শাখার হস্টেলে পৌঁছে যায়। নবোদয় বিদ্যালয়ের হস্টেলে থাকার অভিজ্ঞতা থাকায় এখানেও মানিয়ে নিতে তার অসুবিধা হয়নি। নিটের প্রস্তুতির জন্যে শুরু করে অব্যাহতিহীন মিশনের ক্লাস ও সেল্ফ স্টাডি। প্রতিদিন স্টাডির একটা সীমা নির্ধারণ এবং সেটি শেষ না করে ঘুমোতে না-যাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এভাবেই সে গতবছরের থেকে প্রায় ২০০ নম্বর বেশি যোগ করে ২০২৪-এ পায় ৫৮৯ নম্বর। সাফল্যের সীমা অতিক্রম না করতে পারলেও নম্বর প্রাপ্তির প্রভূত উন্নতিতে আশাবাদী হয়ে ওঠে। ঘরের লোকের আশ্বাস আরেকটা বছর চেষ্টার জন্যে তাকে অনুপ্রাণিত করে। মিশনের গাইডলাইন মেনে দশ মাসের পরিকল্পিত পরিশ্রমে শাহনওয়াজের মুখে আজ চওড়া হাসি। ২০২৫-এ তার প্রাপ্ত নম্বর ৫৩০। এবং সে পৌঁছে যায় মেডিকেল কলেজের এম.বি.বি.এস. ক্লাসে।

এই সংবাদে নুরুল ইসলাম সরদার ও মনিমন বিবির পরিবারে অকালের ইদ উৎসব দেখা যায়। স্নাতক বাবা ও উচ্চ-মাধ্যমিক পাস মায়ের সন্তান এলাকার গৌরব হয়ে উঠেছে। শাহনওয়াজই নওয়াপাড়ার প্রথম তারকা, যে সরকারি মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস. পড়ছে। তার ভাই মাহমুদ মিশনের গোলাবাড়ি ক্যাম্পাসে নিটের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ছোটোবোন সোহানি পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী।

ছোটোবেলা থেকেই ছবি আঁকা, রূপকথা ও গল্পের বই পড়ার অভ্যেসে মাঝে কিছু দিন ছেদ পড়ে গিয়েছিল। এখন আবার সেটি শুরু করতে উদ্‌গ্রীব শাহনওয়াজ। তার ইচ্ছে স্নাতকের পরে গাইনোকোলজি নিয়ে মাস্টার্স করার। সে দেখছে তাদের এলাকার মহিলাদের প্রায় সকলেই মহিলা চিকিৎসকের কাছে গিয়ে স্বস্তি পান। মানুষের সেবা এবং সুচিকিৎসার পাশাপাশি প্রয়োজনে দুঃস্থদের সাহায্যের নিয়তেই মেডিকেল পেশায় এসেছে বলে জানাল সে। মহানবি মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনেতিহাসের ধৈর্যশীলতা ও ক্ষমাধর্মের দৃষ্টান্ত আমাদের সকলের জন্যে অনুকরণীয় বলে মন্তব্য করে শাহনওয়াজ। ২০২৬-এর নিট-প্রত্যাশীদের জন্যে তার পরামর্শ হল— ধারাবাহিক কঠোর পরিশ্রম, বার বার রিভিশন এবং শরীর ও মনের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকা। ■

সোহাইল জামিল

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২৪০৩২

বর্ধমান মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

প্রত্যেকটি বড়ো সাফল্য আসলে অনেক ছোটো ছোটো সাফল্যের সমাহার। এক ধাপ এক ধাপ করে এগিয়ে গিয়েই সাফল্যের শিখরে ওঠা যায়। নিট পরীক্ষায় যেসব ছেলে-মেয়ে সফল হচ্ছে বা সফল হয়, তা তারা এক দিনে হয় না। এর পেছনে থাকে বহু দিনের মেহনত। মাধ্যমিক বা উচ্চ-মাধ্যমিকের ফল কিছু আগাম পূর্বাভাস দিয়ে দেয় একজন ছাত্র বা ছাত্রীর ভবিষ্যৎ কতটা উজ্জ্বল সে-বিষয়ে। সোহাইল জামিল মাধ্যমিকে ৯৩.৪৩ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করার পরই তার বাবা-মা আশায় বুক বাঁধেন যে, তাঁদের ছেলে ডাক্তার হবে। সেই স্বপ্ন সামনে রেখে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেন। মাধ্যমিকের পরই সোহাইলকে আল-আমীন মিশনে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা।

আমরা আগের একটি লেখাতেই জানিয়েছিলাম আল-আমীন মিশনের দেখানো পথ ধরে রাজ্যে অনেক আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কিন্তু, আল-আমীন মিশন নিট পরীক্ষার প্রস্তুতির যে-ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পেরেছে অন্য মিশনগুলো তা পারেনি। ফলে বহু ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক পর্যন্ত অন্য আবাসিক মিশনে পড়াশোনা করলেও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে বা নিট কোচিং নিতে আল-আমীন মিশনই তাদের প্রথম পছন্দ। সোহাইল জামিলের ক্ষেত্রেও তেমনটা হয়েছে। সে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একটা মিশনে পড়াশোনা করে ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে। পায় ৯৩.৪২ শতাংশ নম্বর। এর পর ছেলেকে ডাক্তার করার লক্ষ্যে আল-আমীন মিশনে ভর্তি করেন তার বাবা-মা। সোহাইল নয়াবাজ শাখায় পড়াশোনা করেছে। ২০২৫ সালে সে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে পায় ৯১.২ শতাংশ নম্বর। এবং আরও চমকপ্রদ সাফল্য হল সে রানিং ইয়ারেই নিট ক্লিয়ার করতে সক্ষম হয়েছে। ২০২৫ সালে নিট (ইউজি) পরীক্ষায় সে ৫৩০ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় স্তরে র‍্যাঙ্ক করেছে ২৪০৩২। আল-আমীন মিশনের উন্নত পঠন-পাঠন ব্যবস্থায় মাত্র দু-বছর ব্যয় করেই একইসঙ্গে উচ্চ-মাধ্যমিক ও নিট পরীক্ষায় সফল হয়ে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। এবং এরকম উদাহরণ শুধু এক-দুটো নয়, অনেক। এমনকী অধ্যবসায় আর পরিশ্রম করার মানসিকতা থাকলে কুড়ি-পঁচিশ লাখ পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম পাঁচশো বা এক হাজারের মধ্যেও র‍্যাঙ্ক করছে অনেকে। ২০২৪ ও ২০২৫ সালের নিট পরীক্ষার ফলই এটা প্রমাণ করে দিয়েছে।

আমরা যে সোহাইল জামিলের কথা বলছি তার বাড়ি মালদা জেলার চাঁচল থানার খানপুর গ্রামে। পিতা মহম্মদ মতিউর রহমান এম.এ. পাস। ব্যাবসা করেন। মা সালমা সুলতানার পড়াশোনা মাধ্যমিক পর্যন্ত। তিনি একজন গৃহিণী। সোহাইলের ছোটো একটা বোন আছে। সেও পড়াশোনা করছে। সন্তানদের লেখাপড়া নিয়ে যে সোহাইলের বাবা-মা অত্যন্ত যত্নশীল, তা না বললেও বোঝা যায়।

সোহাইল যে এত ভালো ফল করেছে তার পেছনে আছে প্রচুর পরিশ্রম। সে মনে করে নিট পরীক্ষায় সফল হতে গেলে দরকার, 'রিভাইজ ওয়ান হানড্রেড টাইমস'। মানে, এক বার নয়, বার বার পড়া। সে বিশ্বাস করে, যত বার পড়া যায়, তত বার বিষয়গুলো ভালোভাবে মনে রাখা যায়। এ-অভ্যাসই তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে তার সহপাঠীদের চেয়ে। সোহাইলের পছন্দের বিষয় জীবনবিজ্ঞান। প্রিয় ভারতীয় হলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, যিনি সমগ্র ভারতবাসীর কাছে সাহস ও দেশপ্রেমের প্রতীক। ক্রিকেট তার প্রিয় খেলা। খেলাধুলায় সে সৌরভ গাঙ্গুলিকে খুব পছন্দ করে। ■

সেখ যায়েদ ইফতিখার

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২৪২৪৮

বারাসাত গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

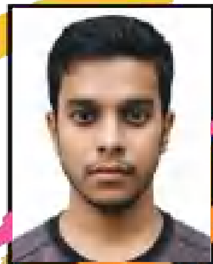

মেটিয়াবুরুজ, বাঁকড়া, ডোমজুড়— এই এলাকাগুলোর আর্থ-সামাজিক চরিত্র অনেকটা একইরকম। এবং সেটা মূলত রেডিমেড জামা-কাপড়ের ব্যাবসার হাত ধরে। এলাকার বেশিরভাগ মানুষ এই ব্যাবসার কোনো-না-কোনো একটা দিকের সঙ্গে নিজেদের জুড়ে নিয়ে জীবিকার সংস্থান করে নিয়েছেন। কাটিং, স্টিচিং, এমব্রয়ডারি, ডাইয়িং— এমন নানা ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। হাজার হাজার মানুষ যুক্ত। কিন্তু, এইসব এলাকার একটা বড়ো সমস্যা হল শিক্ষার প্রতি অবহেলা। সামান্য পড়াশোনা করে বংশ পরম্পরায় চলে আসা ‘হাতের কাম’ শিখে নিলেই কাঁচা পয়সা রোজগার করা যায়। লেখাপড়া শিখে চাকরি পাওয়া যায় না— এই বাক্য লেখাপড়া বিমুখতার বড়ো একটা কারণ। ফলে এইসব এলাকার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে পড়াশোনা করার প্রতি অনীহা বহুদিনের। মেয়েরা যদিওবা কিছুটা করে, ছেলেরা মাধ্যমিক বা তার আগেই ড্রপ আউট হয়ে যায়। কিন্তু গত এক-দু দশক থেকে ধীরে হলেও ছবিটা বদলাচ্ছে। তার নেপথ্যকারণ আবাসিক শিক্ষা আন্দোলন, বিশেষ করে আল-আমীন মিশনের প্রত্যক্ষ প্রভাব। ওইসব এলাকায় মিশনের কিছু শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে নীচু ক্লাস থেকেই পড়াশোনা হয়। নিট কোচিংও দেওয়া হয়। অনেক ছেলে-মেয়ে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ায় পরিবারের সম্মান বহু গুণ বেড়ে গেছে। একটা পরিবারের এমন পরিবর্তন প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও ভাবনার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে।

এইরকম একটা ব্যবসায়ী পরিবার হল হাওড়া জেলার ডোমজুড় থানার অঙ্কুরহাটির সেখ সিরাজুল হকের পরিবার। তিনি মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। বাচ্চাদের রেডিমেড জামা-কাপড়ের ব্যাবসা করেন। স্ত্রী মামদুদা বেগমও মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছেন। তিনি একজন গৃহিণী। তাঁদের একমাত্র সন্তান সেখ যায়েদ ইফতিখার। সে এ-বার এম.বি.বি.এস. পড়ার সুযোগ পেয়েছে। ভর্তি হয়েছে বারাসাত গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে।

যায়েদ ইফতিখার আল-আমীন মিশনে পড়েছে ক্লাস ফাইভ থেকে। পড়ত খলতপুর শাখায়। ২০২২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে দুর্দান্ত ফল করে। পেয়েছিল ৯৪.৪৪ শতাংশ নম্বর। আর ২০২৪ সালে উচ্চ-মাধ্যমিকে পায় ৯১ শতাংশ নম্বর। গতবছর, অর্থাৎ রানিং ইয়ারে সে নিট পরীক্ষায় বসে পেয়েছিল ৫৬৯ নম্বর। রানিঙে সে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ না পেলেও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাওয়া তার জন্যে শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। তাই যায়েদ খলতপুর শাখাতেই নিটের কোচিং নেয় এক বছর। আর এই এক বছরের পড়াশোনা, কঠোর পরিশ্রম তার নামের আগে ডাক্তার শব্দ আজীবনের জন্যে জুড়ে দেওয়ার নিশ্চয়তা তৈরি করে দিয়েছে। সেইসঙ্গে পরিবারের সামাজিক মর্যাদাও যে বদলে যাবে অচিরেই তাও নিশ্চিত।

কিন্তু এই অর্জন এক দিনের নয়। ক্লাস ফাইভে যে-দিন মিশনে যায়েদকে দিয়ে এসেছিলেন সে-দিন বাবা-মা শুধু ভেবেছিলেন তাঁদের সন্তান ভালো করে পড়াশোনা শিখবে। যায়েদ মন দিয়ে পড়াশোনা করেছে। তারপর মিশনের পরিবেশ যায়েদকে ডাক্তার হতে অনুপ্রাণিত করেছে। ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাওয়ার পরে সে কেবল তার পরিবারের নয়, এলাকারও গর্ব আজ। ■

আব্দুল খালেক

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২৪৭৭২

ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

“ফোকাস রাখতে হবে কেবলই নিট পরীক্ষার দিকে। মিশনের মকটেস্ট বা অন্য টেস্টে দু-এক বার কম নম্বর পেলেও নিজেকে দুঃখিত করার কোনো কারণ নেই। গোটা বছর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পড়াশোনা করলে ইনশা আল্লাহ্ ভালো ফল হবেই।”— নতুন শেসনের এম.বি.বি.এস. পড়ুয়া আব্দুল খালেকের মত এটি। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার কুমেদপুর গ্রামের ছাত্র খালেকের শিক্ষা শুরু হয় স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলে। মালদা জেলার জোতপরম হাই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে সে। এই বিদ্যালয় থেকেই ২০১৮ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮৭ শতাংশ নম্বর পায় খালেক।

কয়েক বিঘে নিজস্ব জমিতে কৃষিকাজের আয়েই চলে খালেকদের পরিবার। খালেকের আব্বা জহুরুল হক এই কাজে নিয়োজিত। তিনি মাধ্যমিক পাস। মা মাইমুনা খাতুন গৃহবধূ। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন। সম্প্রতি তার দাদা মনিরুল প্রাইভেট সংস্থায় ফার্মাসিস্টের কাজে যোগ দিয়েছেন। বোন জফরিন একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। মিশনের একাদশ শ্রেণির প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করলে, তার জন্যে শাখা নির্ধারিত হয় উলুবেড়িয়া। বাড়ি থেকে অনেক দূরত্ব হওয়ার জন্যে ভর্তি হয়নি। মাধ্যমিকের রেজাল্ট বের হলে পুনরায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসে এবং পাস করে। এ-বার মিশন কর্তৃপক্ষ শাখা নির্ধারণ করেন বাড়ির কিছুটা কাছে মালদহে। তাদের পারিবারিক আর্থিক অবস্থা দুর্বল হওয়ার কারণে মাত্র এক চতুর্থাংশ মাসিক বেতনে তাকে ভর্তি করা হয়। মালদা শাখা থেকে ২০২০ সালে ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় খালেক।

মাধ্যমিক পর্যন্ত ভবিষ্যতের কেরিয়ার নিয়ে খালেকের কোনো ধারণাই ছিল না। আল-আমীন মিশনে এসে এখানকার পরিবেশে বুঝতে পারে পরিশ্রম করলে ডাক্তারি পড়ার প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করা সম্ভব। সেভাবেই মনস্থির করে ফেলে খালেক। করোনাকালে ২০২১-এ মিশনের গোলাবাড়ি শাখায় নিটের কোচিং নিতে ভর্তি হয়। ক্লাস হয় অনলাইনে এবং সে পায় ৪০৭ নম্বর। পরের বছর ২০২২-এ উনসানির হস্টেলে পড়াশোনা করে ৪৯৮ নম্বর পায়। ২০২৩-এ শাখা পরিবর্তন করে খলিশানি শাখায় চলে আসে। এখানে ২০২৩ ও ২০২৪-এ যথাক্রমে ৫৭৭ ও ৬২১ নম্বর পায়, যা কাট অব মার্কস থেকে সামান্য কয়েক নম্বর কম। এই রেজাল্টে খালেক একটু মুষড়ে পড়ে। খলিশানির ইনচার্জ আনিসুর রহমান ও খালেকের বন্ধুরা তাকে আরেক বার নিটে বসতে উৎসাহিত করে। ফলে এ-বছর আর তাকে ব্যর্থ হতে হয়নি। ৫২৯ নম্বর পেয়ে ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জনপদ কুমেদপুরের প্রথম সন্তান খালেক, যে এম.বি.বি.এস. পড়ার সুযোগ পেয়েছে।

চোখ আমাদের শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং নিজের চোখ নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়েছে তাকে। সে-কারণে খালেক ভবিষ্যতে চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ হতে আগ্রহী। ন্যূনতম বেতনে গরিব ও অসহায়দের পাশে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে সে এখন থেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আব্দুল খালেক জানায়, “মিশনের জেনারেল সেক্রেটারি এম নুরুল ইসলাম স্যার আমার আব্বার মুখ দেখেই খুব কম বেতনে আমাকে ভর্তি করে নেন। এই বদান্যতা আমরা কোনোদিন ভুলব না।” ■

সেখ আতিয়ার রহমান

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২৫৭৪৬

বর্ধমান মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

গ্রামীণ কৃষিজীবী পরিবারের সন্তান সেখ আতিয়ার রহমানের পড়াশোনা প্রাইমারি স্কুলে শুরু হয়। পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয় সিহর অধর মিত্র উচ্চ বিদ্যালয়ে। এই প্রতিষ্ঠান থেকেই ২০২০ সালে ৮৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করে মাধ্যমিক পরীক্ষা। আতিয়ারের বাবা সেখ মতিয়ার রহমান নিজেদের বিঘে খানেক জমিতে চাষাবাদ করে সংসার নির্বাহ করেন। গৃহবধূ মা রুপা বেগম চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন। আতিয়ারের দিদি রিজিয়া খাতুন সে-সময় দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। এখন তিনি নার্সিং পাস করে চাকুরিরত। আতিয়ার যখন নবম শ্রেণির ছাত্র পারিবারিক সমস্যার কারণে আতিয়ারের আব্বার আর্থিক ছত্রছায়া থেকে বঞ্চিত হয় পরিবার। খুবই কঠিন পরিস্থিতিতে তার মা শক্ত হাতে সংসারের হাল ধরেন। বাঁকুড়া জেলার কোতলপুর থানার লঙ্কাজল গ্রামে আতিয়ারদের বসবাস।

এই পরিস্থিতিতে আতিয়ারের পড়াশোনার ভার প্রায় পুরোটাই নিজের কাঁধে তুলে নেন বড়োচাচার বড়োছেলে সেখ আতাউর রহমান। তাঁর অন্য পরিচয় তিনি আল-আমীন মিশনের প্রাক্তনী। আতিয়ারের পড়াশোনার একাগ্রতা ও মেধা লক্ষ করে তাকে আল-আমীনে ভর্তি করতে তিনি উদ্যোগী হন। ২০২০-তে আতিয়ার মিশনের বর্ধমান শাখায় একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়। ওই শাখা থেকেই ২০২২-এ ৯২ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাস করে। ভালো রেজাল্ট হওয়ায় আতাউর রহমান তাকে নিটের কোচিং নিতে মিশনের গোলাবাড়ি শাখায় ভর্তি করেন। ২০২৩-এ নিটে আতিয়ার ৩৫০ নম্বর পায়। রানিং ইয়ারের নিটে তার নম্বর ছিল ১৩২। ২০২৪-এ আতিয়ার মিশনের পাঁচুড় শাখা থেকে পায় ৫৯৫ নম্বর। সাফল্যের খুব সামনে এসেও নিট ক্র্যাক না করতে পারার জন্যে আতিয়ার একটু মুষড়ে পড়ে। তবে তার মা, দিদি এবং বিশেষ করে তার দাদার উৎসাহে নতুন করে স্টাডিতে মগ্ন হয়। মিশনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও নিজের অসম্ভব পরিশ্রমের ফলে এ-বছরের নিটে তার সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২৫৭৪৬ এবং প্রাপ্ত নম্বর ৫২৭। ছেলের খুশির খবর শুনেই মায়ের আনন্দাশ্রু আর বাধা মানে না। দিদি এবং পরিবারের আত্মীয়স্বজন, বিশেষ করে দাদা আতাউর আতিয়ারকে মিষ্টিমুখ করান ও শুভেচ্ছা জানান। খুশির এই মুহূর্তেও পরিবারের দুঃসময়ের কথা স্মরণ করে আতিয়ার বলে, “এই সাফল্যে আমার মায়ের অবদান সবচেয়ে বেশি। দাদা আতাউর ও মিশনের অবদানও অনস্বীকার্য এবং মিশনের মতো পড়ার পরিবেশ আর-কোথাও পাওয়া সম্ভব না। আল-আমীন মিশন স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন পূরণ করে।”

আতিয়ার এম.বি.বি.এস. কমপ্লিট করার পরে কার্ডিয়োলজি বিষয়ে এম.ডি. করার স্বপ্ন দেখছে। তার ইচ্ছে সপ্তাহে এক দিন নিজ এলাকায় পয়সার অভাবে চিকিৎসাবঞ্চিতদের বিনামূল্যে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা। একশো শতাংশ মুসলমান সম্প্রদায় অধ্যুষিত লঙ্কাজল গ্রামে আতিয়ার এম.বি.বি.এস.-এর দ্বিতীয় পড়ুয়া। প্রথম জনও তাদের পরিবারের, বড়োচাচার ছেলে মুসরাইল রহমান বর্তমানে এম.ডি. করছেন। অবশ্যই দু-জনই আল-আমীনে পড়াশোনা করে নিট ক্র্যাক করেছে। ■

মহম্মদ সাইমনুল হক

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২৬১১২

মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

ছোটোবেলায় মা অসুস্থ হলে তার মাথায় হাত দিয়ে বলতেন, "তুই বড়ো হয়ে ডাক্তার হবি, আমার চিকিৎসা করবি।" প্রায় দেড় দশক পরে সেই সন্তান সাইমনুল এখনও ডাক্তার হয়নি ঠিকই, কিন্তু ডাক্তারি পড়ার প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে ফেলেছে। মহম্মদ সাইমনুল হক এখন এম.বি.বি.এস.-এর ছাত্র। স্থানীয় স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পরে মিশনের খলতপুর শাখায় নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। ২০২৩-এ খলতপুর শাখা থেকেই মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৫.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করে। একাদশ শ্রেণির পড়াশোনা আরম্ভ করে খলতপুরেই। ৯৬ শতাংশ নম্বর নিয়ে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়। একই বছরে এরচেয়েও বড়ো সাফল্য অর্জন করেছে সাইমনুল। রানিং বর্ষেই নিট (ইউজি) পরীক্ষায় ৫২৭ নম্বর পেয়েছে। তার নিজের এবং মায়ের ইচ্ছেকে সফল করে এম.বি.বি.এস. পড়তে পৌঁছে গেছে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে।

উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার সঙ্গেই নিট ক্র্যাক করা সহজ নয়। খুব কম সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীই এই আপাত অসাধ্যকে অতিক্রম করতে পারে। সাইমনুল জানায়, উচ্চ-মাধ্যমিক ও নিটের সিলেবাস প্রায় একই হওয়ায় ইলেভেন থেকেই পরিকল্পনার সঙ্গে পড়াশোনা জরুরি। প্রত্যেকটি চ্যাপ্টার ভালো করে বুঝেই পড়তে হবে। বার বার পড়তে হবে। বিশেষ করে ফিজিক্স ও ফিজিকাল কেমিস্ট্রিতে জোর দিতে হবে। কঠিন সমস্যাগুলোকে সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে কনসেপ্ট পরিষ্কার রাখলে নিটের সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। নিটের রেজাল্ট প্রকাশিত হলে তাদের বাড়িতে খুশির বাতাস বইতে শুরু করে। আব্বা, মা, নিকট-আত্মীয় ও প্রতিবেশী এই আনন্দ উদ্‌যাপনে মেতে ওঠেন। শুভসংবাদে বাঙালি সংস্কৃতির মিষ্টিমুখের রেওয়াজে সকলে সামিল হন।

মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানাধীন বাঁকিপুর গ্রামের ছাত্রের সাফল্যের সংবাদ মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার হাজার হাজার গ্রামের মতো বাঁকিপুরের কোনো ছেলে-মেয়ে এতদিন পর্যন্ত নিটে সফল হয়নি। সাইমনুল সেই রেকর্ড স্পর্শ করে গ্রামবাসীর সুনাম বাড়িয়েছে। সাইমনুলের আব্বা মহম্মদ মনিরুল হক হাই স্কুলের শিক্ষক। রসায়নে স্নাতকোত্তর। মাধ্যমিক পাস মা মনোয়ারা বেগম গৃহকর্ত্রী। তার বিবাহিতা দিদি শবনম ফিজিকাল এডুকেশনে স্নাতকোত্তর। অন্য দিদি সেহেলী দিল্লি আইআইটি-তে রসায়নে স্নাতকোত্তর পাঠরত। দাদা আকরামুল রামপুরহাট কলেজের রসায়নে সাম্মানিক স্নাতক বর্ষের ছাত্র।

সাইমনুল এম.বি.বি.এস. কোর্স সম্পূর্ণ করার পরে হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ হতে আগ্রহী। মেডিসিন তার অপছন্দ, শল্য চিকিৎসক হওয়া তার লক্ষ্য। সে বলে, তাদের এক আত্মীয়ের কাছে মিশনের খোঁজ পেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে পাস করে খলতপুরে ভর্তি হয়। নিজেদের বাগানে ফল ও ফুলের চারাগাছ লাগাতে তার খুবই পছন্দ। নিট-পরীক্ষার্থীদের জন্যে তার পরামর্শ হল, সবরকম প্রশ্ন, বিশেষ করে তুলনামূলক কঠিন প্রশ্নকে এড়িয়ে গেলে হবে না। বার বার রিভিশন করে সমাধান বের করতে হবে। উচ্চ-মাধ্যমিকের সঙ্গে নিটের সাফল্য নিয়ে সাইমনুল জানায়, "রানিং বর্ষে নিটের সাফল্যে মানসিক তৃপ্তি অনুভব করছি। আব্বু-মায়ের মুখের হাসি ফোটাতে সক্ষম হয়েছি। আল-আমীনের পড়াশোনা ও হস্টেলের ব্যবস্থাপনায় নিটের প্রস্তুতি নেওয়া সহজ হয়। অবশ্যই আল্লাহ্‌তালার অনুগ্রহেই এই সাফল্য।" ■

মির্জা নাজীব হাসান

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২৭৫৭২

বর্ধমান মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

প্রিয় বিষয় জীববিদ্যা। অন্যতম প্রিয় ভারতীয় ও প্রিয় বাঙালি একই ব্যক্তি— বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু। সদ্য-প্রকাশিত ২০২৫-এর নিটের রেজাল্টে তার সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২৭৫৭২। তার বর্তমান শিক্ষাঙ্গান বর্ধমান মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল। জীববিদ্যা ও বিজ্ঞানী যার প্রিয় সেই তরুণের পিতা গণিতে সাম্মানিক স্নাতক এবং কাকু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষক। তার পড়াশোনার দেখভাল করতেন মুখ্যত তিন জন— বাবা, কাকু ও তার মা। মির্জা নাজীব হাসান রানিং ইয়ারেই নিট ক্র্যাক করে বিজ্ঞানের প্রতি গভীর অনুরাগের প্রমাণ রেখেছে। নাজীবের বাবা একজন ব্যবসায়ী এবং উচ্চ-মাধ্যমিক পাস মা হুরমাতুন নেসা গৃহকর্ত্রী। একমাত্র বোন নৌসিন তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। নাজীবদের বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার ইছাইপুর গ্রামে।

নাজীবের সাফল্যের এই যাত্রাপথে শুরু থেকেই অঙ্গাগিভাবে জড়িয়ে আছে আল-আমীন মিশন। পাশের গ্রাম উচাহারের এক নার্সারি স্কুলে পড়ত নাজীব। সেখানেই সাক্ষাৎ মিশনের মেদিনীপুর শাখার সুপারিনটেনডেন্ট সেখ মহম্মদ ইস্রাফিল স্যারের সঙ্গে। তাঁরই পরামর্শে মিশনের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসা। পাস করে মেদিনীপুর শাখাতেই পঞ্চম শ্রেণিতে শুরু হয় নাজীবের হস্টেলজীবন। মেদিনীপুর শাখা থেকেই ২০২৩-এ ৯৪.৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। একাদশ শ্রেণিতে মিশনের নয়াবাজ শাখায় ভর্তি হয়। উচ্চ-মাধ্যমিকে ২০২৫ সালে তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৯.৪ শতাংশ। একইসঙ্গে ২০২৫-এর নিট পরীক্ষাও দেয় নাজীব। নিটের রেজাল্ট প্রকাশিত হলে ৫২৫ নম্বর পেয়ে নাজীব হয়ে ওঠে তাদের গ্রামের প্রথম এম.বি.বি.এস. পড়ুয়া।

নাজীব জানায়, একাদশ শ্রেণির মধ্যভাগ থেকেই নিট-ফোকাসড স্টাডি শুরু করে। একই ক্যাম্পাসে নিটের জন্যে কোচিং নেওয়া সিনিয়র দাদারা থাকত। তাদের কাছ থেকেও নিট বিষয়ে বহু সমস্যার সমাধান পাওয়া যেত। একদিকে চলত উচ্চ-মাধ্যমিকের সিলেবাস পাঠ, এরই পাশাপাশি নিটের প্রস্তুতি। নাজীব স্বীকার করে নিটের পড়াশোনার প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়ার ফলে উচ্চ-মাধ্যমিকে তার নম্বর একটু কম এসেছে। নাজীবের মতে, নিটের সাফল্যের জন্যে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে স্টাডি জরুরি। দু-তিনটে বই অধ্যয়নের পরিবর্তে একটি ভালো বই দু-তিন বার পড়া বেশি উত্তম। তা ছাড়া যখন যে-বিষয় পড়তে ভালো লাগবে সে-সময় সেটিই পড়তে হবে।

মিশনে ভর্তি হয়েও প্রথম দিকে নাজীবের মনস্কামনা ছিল আর্কিটেক্ট হওয়া। ক্লাস নাইনের পর থেকে ইচ্ছে জাগে চিকিৎসক হতে হবে। এ ছাড়া অভিভাবকদেরও অভিলাষ ছিল ছেলে ডাক্তার হোক। ডাক্তারি পড়ার ছাড়পত্র পেয়েছে শুনে স্বভাবতই বাবা, মা, কাকু এবং আত্মীয়স্বজনেরা শুভেচ্ছা ও দোয়ায় আপ্লুত করেন নাজীবকে। গ্রামের ছোটো-বড়ো সকলের কাছে নাজীবের সাফল্যের কাহিনি ছড়িয়ে পড়ে। এম.বি.বি.এস. কোর্স শেষ করার পরে নাজীবের স্বপ্ন পেডিয়াট্রিক বিষয়ে এম.ডি. করা। তার আরও ইচ্ছে চাইল্ড সাইকোলজি নিয়ে গবেষণার। নাজীবের মতে, "সর্বদা পড়াশোনার মধ্যে থাকা, জানবার ইচ্ছে নিটে সাফল্যের ইন্ধন জোগায়। এবং অবশ্যই এটিও বিশ্বাস করতে হবে, যদি তুমি নিজেকে সাহায্য কর, আল্লাহ্‌তালাও তোমাকে সাহায্য করবেন।" ■

আকাশ মণ্ডল

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২৭৯৫৭

বর্ধমান মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

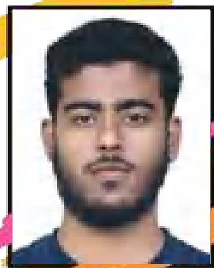

২০২৪ সালের ১২ ডিসেম্বর দিনটি আকাশ মণ্ডলের জীবনে চিরদিনই জড়িয়ে থাকবে। তার আব্বা কলকাতা থেকে ট্রেনে করে বাড়ি ফিরছিলেন। কৃষ্ণনগরে নেমে মোটরসাইকেলে করে আসার সময় পথদুর্ঘটনায় তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটায় তাঁর ইন্তেকাল হয়। আকাশ ও তার ভাই বাদশা পিতৃহীন হয়ে পড়ে। বর্ধমান মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার প্রাক্কালে তাঁর আব্বাকে বার বার স্মরণ করছিল। ভাবছিল তিনি থাকলে কতই-না খুশি হতেন।

নদীয়া জেলার চাপড়া থানার কড়ুইগাছি গ্রামের আনারুল মণ্ডল একজন কৃষিজীবী মানুষ ছিলেন। মাধ্যমিক পাস তিনি নিজেদের বিঘে তিনেক জমির চাষাবাদেই সংসার নির্বাহ করতেন। উচ্চ-মাধ্যমিক পাস আকিচতারা মণ্ডল প্রাইমারি স্কুলের প্যারাটিচার। তিনিও সংসার চালাতে স্বামীকে যোগ্য সঙ্গ দিতেন। নিজেরা খুব বেশি পড়াশোনার সুযোগ না পেলেও, তাঁদের ইচ্ছে ছিল সন্তানদের ভালো স্কুলে পড়াশোনা করাবেন। আকাশের মেডিকেল কলেজে পড়ার খুশির মধ্যেও তার আব্বার অনুপস্থিতিতে বিহ্বল হয়ে পড়েন আকাশের মা।

আকাশের পড়াশোনা শুরু হয় বেসরকারি বাঙ্গালঝি রামকৃষ্ণ স্কুলে। প্রথম শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত এখানেই পড়েছে। ২০১৯ সালে মাধ্যমিকে ৮০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাস করার পরে আব্বা-মা আকাশকে আল-আমীন মিশনে ভর্তি করেন। একাদশ শ্রেণির পড়াশোনা শুরু হয় মিশনের বেলডাঙ্গা শাখায়। উচ্চ-মাধ্যমিকে ৮৭ শতাংশ নম্বর পায়। এরপর আব্বা-মা ও তার নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্যে নিটের কোচিং নেয় মিশনের উলুবেড়িয়া শাখায়। এখান থেকেই ২০২২ ও ২০২৩-এ নিটে যথাক্রমে ৪০০ ও ৫৪৪ নম্বর পায়। পরের বছর ২০২৪-এ খলতপুরে কোচিং নিয়ে পায় ৬২৯ নম্বর। কাট অব মার্কস থেকে মাত্র কয়েক নম্বর কম। এই পরিস্থিতিতে সেক্রেটারি স্যার ও অভিভাবকদের সিদ্ধান্ত হয় সেমি গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার। কিন্তু, আর্থিক প্রশ্নে অসুবিধের জন্যে ভর্তি হতে পারেনি আকাশ। শেষমেষ পুনরায় আরেক বছর নিটের জন্যে চেষ্টা চালাতে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয় সে।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে খলতপুর হস্টেলে যাওয়ার দিন ছিল। কিন্তু সে-সময়ই ঘটে গেল দুর্ঘটনা। এই কঠিন পরিস্থিতিতেও দু-সপ্তাহ পরে আকাশকে তার মা বলেন, “তোর আব্বার স্বপ্ন পূরণ করতে হবে।” মাকে একা বাড়িতে রেখে হস্টেলে যেতে আকাশের মন সায় দিচ্ছিল না। মিশনের সেক্রেটারি স্যারকে ফোন করলে তিনিও তাকে মিশনে আসতে বলেন। শেষমেষ ৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে হস্টেলে চলে আসে। সাত-আট মাস পড়া থেকে দূরে থাকা ও আব্বার চলে যাওয়ার আঘাত সামলাতে প্রথম দিকে কষ্ট হত। বন্ধুদের পাশে পেয়ে পড়াশোনায় মগ্ন হয়ে ওঠে। নিটের রেজাল্ট প্রকাশিত হলে দেখা গেল আকাশ ৫২৫ নম্বর পেয়ে তার মরহুম আব্বার স্বপ্ন পূরণ করে ফেলেছে। খুশির এই খবরে তার মা কেঁদে ফেলেন। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীরা শুভকামনায় আপ্লুত করেন। উভয় সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্যে ভরা কড়ুইগাছি গ্রামের নিটে সফল প্রথম সন্তান আকাশ। সে জানায়, তার ইচ্ছে ভবিষ্যতে অর্থোপেডিক সার্জন হওয়ার। চিকিৎসক হওয়ার পরে সে এলাকার দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসা এবং অভাবী মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর। ■

মোনালিসা পারভীন

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২৮৫১৩

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

সাল ২০২২। মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে ৯৭.৭ শতাংশ নম্বর পায়। ২০২৪-এ উচ্চ-মাধ্যমিকে তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৫.২ শতাংশ। ২০২৫ সালের নিট পরীক্ষায় তার অর্জন ৫২৪ নম্বর। মাধ্যমিক থেকে নিট পর্যন্ত রেজাল্টে এই দু-টি বিষয় উল্লেখনীয়। সফল ছাত্রীর নাম মোনালিসা পারভীন। এবং এই সাফল্যের সঙ্গে আল-আমীন মিশনের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবেই জুড়ে রয়েছে। সম্প্রতি এম.বি.বি.এস. পড়তে মোনালিসা বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজে ভর্তিও হয়ে গেছে। মোনালিসা বলে, "এক বাংলা দৈনিকে আল-আমীনের বিজ্ঞাপন দেখি। অনেকে এই প্রতিষ্ঠানে পড়ে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাচ্ছে, এটাই আমার ভর্তি হওয়ার সূত্র ও অনুপ্রেরণা।"

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জীবনতলা থানার হাওড়ামারি গ্রামীণ সমাজে স্বভাবতই আনন্দসংবাদ ছড়াতে শুরু করে। স্বাস্থ্যকর্মী মফিজদ্দিন লস্করের কন্যা ডাক্তারি পড়ার প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করেছে। এর আগে এই গ্রামের কোনো ছাত্র-ছাত্রী এই সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। সে-কারণে এটি আরও বেশি উচ্চারিত, প্রচারিত। অবশ্য মোনালিসার সাফল্যের আগেই একটা মুকুট জুড়ে গিয়েছিল তার মাথায়। ২০২২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্য স্তরে দশম স্থান এবং আল-আমীন মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকার করে মোনালিসা। জীবনতলার বিডিও, থানার ওসি সমরেশ ঘোষ এবং স্থানীয় বিধায়ক শওকত মোল্লা তাদের বাড়িতে এসে সে-সময় তাকে সংবর্ধিত করেন। জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল মিশনের জয়নগর শাখার বার্ষিক অনুষ্ঠানে মোনালিসাকে পুরস্কৃত করেন। ৫ সেপ্টেম্বর ২০২২, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিশ্ববাংলা মেলাপ্রাঙ্গণে সংবর্ধিতও হয় মোনালিসা। সে-সময় থেকেই মোনালিসার সাফল্যে এলাকার অভিভাবকগণ নিজ সন্তানদের আল-আমীনে পড়ানোর বিষয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেন।

মোনালিসার মা আইসিডিএস-কর্মী। তার আব্বা ও মা উভয়েই স্নাতক। বোন সামসুন নাহার মিশনের জয়নগর শাখায় ক্লাস সেভেনে পড়ে। ভাই মেহতাব তালদি শাখায় ক্লাস ফাইভের ছাত্র। দিদির সাফল্যে তারাও উৎসাহিত। মোনালিসা আল-আমীনের বাবনান শাখায় পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। ষষ্ঠ শ্রেণিতে জয়নগর শাখায় চলে আসে। মাধ্যমিক পরীক্ষাও দিয়েছে এই শাখা থেকে। উচ্চ-মাধ্যমিকে দুই বছর পড়েছে খলতপুর শাখায়। উচ্চ-মাধ্যমিকের পরে নিটের এক বছর কোচিংও নিয়েছে খলতপুর ক্যাম্পাসে। সাপ্তাহিক আট-দশটা ক্লাস, ডিপিপি, মডিউল, পিটি ও মকটেস্ট প্রভৃতির সঙ্গে হস্টেলে সেল্ফ স্টাডির সুবন্দোবস্ত থাকায় মিশনের পড়ুয়াদের নিটের পরীক্ষা মোকাবিলা করা সহজ হয়। এর সঙ্গে থাকা জরুরি পেসেন্স, প্র্যাকটিশ এবং প্রেয়ার টু আল্লাহ্। মোনালিসা চায় শিশুদের চিকিৎসা করতে। সে-কারণে এম.বি.বি.এস. করার পরে শিশুরোগ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের স্বপ্ন দেখে। পাশাপাশি চিকিৎসাবিজ্ঞানের নতুন কোনো বিষয় নিয়ে গবেষণা করতেও ইচ্ছুক। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী মোনালিসার মিশনে পড়াশোনার খরচ বহনে অসুবিধাকে মিশন কর্তৃপক্ষ মাসিক বেতনে বেশ ভালো রকমের ছাড় দিয়ে একটু সহজ করে দেয়। কৃতজ্ঞ মোনালিসার মতে, সংখ্যালঘু সমাজের অভাবী মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বপ্ন পূরণে আল-আমীনের চেষ্টার কারণেই রাজ্যের সর্বত্র চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, গবেষক, অফিসার প্রভৃতির দেখা মিলছে। ■

মোসাম্মাদ আনজিরা খাতুন

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২৮৫১৮

কলেজ অব মেডিসিন অ্যান্ড সাগর দত্ত হসপিটাল

এক সম্পর্কিত কাকা আল-আমীন মিশনের কর্মচারী, তাঁর কাছেই মিশনের, বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের নিট পরীক্ষা পাস করে চিকিৎসক হওয়ার কথা শুনেছে। এই সূত্রেই ছাত্রীটির বাবা-মা স্বপ্ন দেখেন তাঁদের মেয়েকেও নিট পরীক্ষায় বসাবেন। নিটে সাফল্যের জন্যে চাই পরিকল্পিত ভালো প্রস্তুতির ব্যবস্থা। সেই হিসেবে আনজিরাকে মিশনের উলুবেড়িয়া (বর্নাটন) শাখায় ভর্তি করা হয় ২০২২ সালে। ছোটোবেলা থেকেই মেধাবী আনজিরার উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া সরকারি স্কুলে। পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয় উলুবেড়িয়ার বাণীবন গার্লস হাই স্কুলে। এই শিক্ষালয় থেকেই ২০২০-তে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮৮.৫ শতাংশ নম্বর পায়। এর পরে উলুবেড়িয়া হাই স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ২০২২-এ উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত নম্বর হয় ৮৬ শতাংশ।

আনজিরা উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার বছরে নিটে বসলেও খুব একটা সন্তোষজনক ফল করতে পারেনি। মিশনের হস্টেলে নিটের পড়াশোনা চালিয়ে ২০২৩ ও ২০২৪-এ যথাক্রমে ৩৯৩ ও ৫৯২ নম্বর পায়। গতবছরের রেজাল্টে সামান্য দুঃখী হলেও, মানসিকভাবে আত্মবিশ্বাসী হয়ে সে প্রতিজ্ঞা করে এ-বছর বাবা-মায়ের মুখে হাসি ফোটাবে। সেই প্রত্যাশা সত্যি সত্যি পূরণ করে ফেলল নিটে ৫২৪ নম্বর পেয়ে। বাবা, মা, আত্মীয়স্বজন ও লোকালয়ের প্রতিবেশীরা তাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। ওই এলাকার প্রথম পড়ুয়া হিসেবে তার এই সাফল্যে গ্রামবাসীরা সকলেই খুবই খুশি।

আনজিরাদের বসতবাড়ি হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া জনপদের আলিপুকুর গ্রামে। বাবা তাহের আলি খান ছোটো ব্যবসায়ী ও মা আজমিরা বেগম গৃহবধূ। তাঁরা দু-জনই মাধ্যমিক পাস। বড়োসন্তান মোসাম্মাদ আনজিরা খাতুন। অন্যদের মধ্যে পুত্র তৌফা দ্বাদশ ও আবু তালেব ষষ্ঠ শ্রেণিতে এবং কন্যা তৌহিদা সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। মধ্যবিত্ত পরিবারের আনজিরার সাফল্যে মুখ্যত ছোটো ব্যবসায়ী ও জরির কারিগর অধ্যুষিত আলিপুকুর গ্রামে লেখাপড়া, বিশেষ করে মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে ধীরে হলেও সচেতনতার বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে।

আগে হস্টেলে থাকার অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে মিশনের হস্টেলে আনজিরা নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হয়। সেলফ স্টাডি ও বন্ধুদের সঙ্গে গ্রুপ স্টাডিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কঠোর পরিশ্রম আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তার এই সাফল্য বলে জানায় সে। এম.বি.বি.এস. কোর্স শেষ করার পরে তার ইচ্ছে গাইনোকোলজি নিয়ে উচ্চ ডিগ্রি অর্জনের। এ ছাড়াও এলাকার সুবিধাবঞ্চিত নিম্নবিত্ত ও নিঃস্ব পরিবারের মানুষদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানও তার ভাবনার মধ্যে রয়েছে। বাংলা গল্প উপন্যাস পড়তে তার ভালো লাগে। এ পি জে আবদুল কালাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার প্রিয়তম ভারতীয় ব্যক্তিত্ব। আনজিরা জানায়, "আল-আমীন মিশন আমার নিটের প্রস্তুতিতে সবরকম সাহায্য করেছে তাই মিশন এবং সেক্রেটারি স্যারের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।" বাবা, মা ছাড়াও উলুবেড়িয়া শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত হাফিজুর স্যার ও স্বপ্না ম্যাডামের ভূমিকাও তার সাফল্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে জানায় আনজিরা। তার এই সাফল্যে অনেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে লেখাপড়ার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হয়ে ওঠার সংকল্প করেছে। ■

বাহারুদ্দিন সেখ

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২৮৮২৮

বর্ধমান মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

“বাবার হয়েছিল মারণ রোগ। তিনি আমাদের নিয়ে খুবই চিন্তিত থাকতেন। সেই সময় আমার দিদি মিতালি খাতুন বাবাকে আশ্বস্ত করেন যে, আমার পড়াশোনার পুরো দায়িত্ব তিনি নেবেন। দিদি বলতে আমার বড়োআব্বার মেয়ে। ক্লাস সিক্সে পড়াকালীন বাবা ইন্তেকাল করেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আমার পড়ার সমস্ত খরচ তিনি বহন করেছেন। ইন্তেকালের আগে তিনি কলকাতার পি জি হাসপাতালে প্রায় দু-মাস চিকিৎসাধীন ছিলেন। আমার বাবা ২০ জুন ২০১৪ সালে ক্যানসার রোগে ইন্তেকাল করেন।”— কথাগুলো বলার সময় চোখ আর্দ্র হয়ে ওঠে বাহারুদ্দিন সেখের। তার বাবা মরহুম সাদিকুর রহমান সেখ নিজেদের বিঘে দুয়েক জমিতে কৃষিকাজ ছাড়াও ভাগচাষ করতেন। পড়াশোনা করেছেন সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত।

নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়া থানাধীন মেচপোতা গ্রামের বাসিন্দা বাহারুদ্দিন। তার মা তানজিলা সেখের পড়াশোনা ক্লাস এইট পর্যন্ত। তিনি ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালন করে থাকেন। ছোটোভাই শাহারুল সেখ স্নাতক স্তরে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। দিদি বাহারুদ্দিনকে প্রায়ই বলতেন আল-আমীন মিশনে পড়ানোর কথা। তিনি মিশনে ভর্তির সমস্ত বন্দোবস্ত করেন। বাহারুদ্দিন স্থানীয় হাই স্কুল থেকে ট্রান্সফার নিয়ে আল-আমীন মিশনের সুধাকরপুর শাখায় নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। ২০১৯-এ ৮৫.৫ শতাংশ নম্বর পায় মাধ্যমিক পরীক্ষায়। একাদশ শ্রেণিতে শাখা পরিবর্তন করে চলে আসে চাপড়া শাখায়। ২০২১-এ ৮২.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করে। দাদু চেয়েছিলেন নাতি চিকিৎসক হোক এবং এর সঙ্গে জুড়ে গেল দিদির ইচ্ছে— বাহারুদ্দিন নিটের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ুক। নিটে সাফল্যের উদ্দেশ্যে ২০২২ সালে কোচিং নিতে সে চলে আসে পাঁচুড় শাখায়। এখানে ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত যথাক্রমে ৪৭৭, ৫০১ ও ৬০৩ নম্বর পেয়ে ক্রমান্বয়ে উন্নতি করে। তবুও সাফল্য না আসার মূল কারণ করোনাকালে হস্টেলে না থেকে বাড়িতে থেকে পড়াশোনা।

জুন ১৪, ২০২৫। সকাল থেকেই দেশের লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর মতোই বাহারুদ্দিন, তার দিদি ও মা অপেক্ষা করছেন নিটের রেজাল্ট জানবার জন্যে। রেজাল্ট প্রকাশ পেলে জানা যায় ৫২৪ নম্বর পেয়ে বাহারুদ্দিনের মুঠোয় চলে এসেছে সাফল্য। বড়োআব্বা, বড়োআম্মা, দিদি এবং মা, চাচাতো ভাইয়েরা যাঁরা সবসময় তার পাশে থেকেছেন, সকলেই খুশির খবরে তাকে মোবারকবাদ জানান। বিশেষ করে মা ও দিদি এ-আনন্দের মুহূর্তে কান্না রোধ করতে পারেননি। বাহারুদ্দিন তাদের গ্রামের তৃতীয় ছাত্র, যে এম.বি.বি.এস. পড়ার প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে গ্রামকে গৌরবান্বিত করল। তার ভবিষ্যৎ ইচ্ছে এম.ডি. এবং ক্যানসার বিষয়ে গবেষণা করা। বাহারুদ্দিন মনে মনে এখন থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছে স্থানীয় মানুষের চিকিৎসা পরিষেবার জন্যে সপ্তাহে একদিন বরাদ্দ রাখবে। বাহারুদ্দিন জানায়, “এই সাফল্যে পরিবারের পাশাপাশি মিশনের সেক্রেটারি স্যারের অবদানও অতুলনীয়। তিনি একেবারে মিনিমাম বেতনে আমাকে মিশনে পড়ার সুযোগ না দিলে আমার পক্ষে এই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হত না। পাঁচুড় শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত সাবির স্যার এবং শাহিদ স্যারের ভূমিকাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।” ■

আলিশা সরদার

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৩২৭৮৭

ডায়মন্ড হারবার গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

যে-দিন নিটের রেজাল্ট প্রকাশিত হয়, সে-দিন আব্দুল করিম সরদারের বাড়িতে ইদের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে। মেয়ে আলিশা সরদার এম.বি.বি.এস. পড়ার ছাড়পত্র পেয়েছে। তাদের জনপদের প্রথম এম.বি.বি.এস. পড়ুয়া হিসেবে সাফল্যের মুকুট উঠেছে তার মাথায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জীবনতলা থানাধীন পূর্ব নারায়ণপুরের আলিশার আব্বা পেশায় সিভিক ভলেনটিয়ার। তার মা রফিকা খাতুন গৃহবধূ। বাবা স্নাতক ও মায়ের পড়াশোনা দশম মান। আলিশার দিদি কোহিনুর বি.এসসি. নার্সিং পড়ছেন এবং বোন আসিকা নিটের কোচিং নিচ্ছে।

আল-আমীনের পরিচয় ও মেডিকেলে সাফল্যের কাহিনি বি.ডি.এস. পড়ুয়া এক আত্মীয়ের কাছে আলিশা শুনেছে। সেই থেকেই তারও ইচ্ছে জাগে আল-আমীনে পড়ার। কিন্তু, একসঙ্গে তিন সন্তানের শিক্ষার খরচ বহনের সঙ্গে আলাদা করে হস্টেলের ব্যয় সম্ভব হচ্ছিল না তার বাবা-মায়ের পক্ষে। আলিশা কিন্তু নাছোড়বান্দা। স্থানীয় নারায়ণপুর অক্ষয় বিদ্যামন্দিরের ফার্স্ট গার্ল শেষমেষ নবম শ্রেণিতে মিশনের জয়নগর শাখায় ভর্তি হয়। ২০২০-তে জয়নগর শাখা থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮৮.৪ শতাংশ নম্বর পায়। একাদশ শ্রেণিতে শাখা পরিবর্তন করে চলে আসে চাপড়ায়। এই পর্বেই আলিশা মানসিকভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয় চিকিৎসক হতে। অভিভাবক, বিশেষ করে তার মায়েরও ইচ্ছে আলিশা ডাক্তার হোক। ২০২২-এ চাপড়া থেকেই উচ্চ-মাধ্যমিকে তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৯ শতাংশ।

ওই বছরের নিট পরীক্ষায় সে ৩৮২ নম্বর অর্জন করে। পরের বছর ২০২৩-এ আলিশা খলতপুরে নিটের কোচিং নিয়ে পায় ৪৮০ নম্বর। এই রেজাল্টে সে খুশি হতে পারেনি। শাখা পরিবর্তন করে চলে আসে উলুবেড়িয়া ক্যাম্পাসে। ২০২৪-এ সন্তোষজনক ৬১০ নম্বর পেলেও সাফল্য থেকে দূরেই রয়ে যায়। বার বার রিভিশন, এনসিইআরটি-র বইগুলি লাইন-বাই-লাইন অধ্যয়ন এবং মিশনের বিভিন্ন টেস্ট দিয়ে ভালোই প্রস্তুত হয়ে ওঠে। ২০২৫-এর নিটের পরীক্ষা দিয়ে সে বুঝতে পারে ইনশা আল্লাহ্‌ এ-বছর সাফল্য আসছে। ফল প্রকাশের পরে জানা গেল, আলিশা পেয়েছে ৫১৯ নম্বর, অর্থাৎ মেডিকেল কলেজে পড়ার স্বপ্ন সফল করে ফেলেছে। খবর শুনে আব্বা-মা খুশিতে কেঁদে ফেলেন। পূর্ব নারায়ণপুরের উভয় সম্প্রদায়ের মানুষজন শুভেচ্ছা জানাতে এসে পরিবারের তরফে মিষ্টিমুখ করে ফেরেন।

আলিশা জানায় তাদের এলাকায় শিক্ষা সচেতনতা বেশ কম। অধিকাংশ পরিবারেই চামড়ার দস্তানা ও জুতো তৈরি করা হয়। আলিশার খবর চাউর হতেই অনেকেই মেয়েদের শিক্ষিত করার মধ্যেও আশার আলো খুঁজছেন। আলিশা এবং তার আব্বা-মায়ের কাছে আল-আমীনের পড়াশোনার বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন। আলিশার ইচ্ছে একজন দক্ষ কার্ডিয়োলজিস্ট হওয়ার। প্রধান কারণ, তার আব্বা হার্টের সমস্যায় ভুগছেন। সে চায় এম.বি.বি.এস. পাস করার পরে চিকিৎসক হিসেবে তার গ্রামের মানুষের কাজে লাগতে। চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যা থেকে তাদের মুক্ত করতে। অবসর সময়ে সবরকম গান শুনতে এবং দেশ-বিদেশের রাজনীতি ও কূটনীতি নিয়ে পড়াশোনা ও তর্কবিতর্ক শোনা তার পছন্দ। ■

সাইদা পারভীন

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৩২৮৫২

নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

মালদা জেলার চাঁচল থানার চামাইপুর জনপদের শিমুলতলা এক প্রত্যন্ত গ্রাম। গ্রামটিতে একশো শতাংশ মুসলমান সম্প্রদায়ের বসবাস। প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময় গ্রামেরই এক শিশু শিক্ষিকার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলত, “ডাক্তার হব ম্যাডাম।” বয়স বাড়লে সাইদার ভাবনায় আসে ডাক্তার হতে হলে ভালো স্কুলে পড়তে হবে। এর জন্যে খরচও অনেক বেশি, যা আব্বার দ্বারা বহন করা অসম্ভব। হাই স্কুলে পড়ার সময় আল-আমীনের নাম শুনেছে ও জেনেছে এই স্কুলে পড়লে ডাক্তার হওয়া সম্ভব। তাদের গ্রামেরই এক দাদা আল-আমীনে পড়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে। সাইদা স্থানীয় গোবিন্দপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০২১ সালে ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করে। সাইদার আব্বা-মা মেয়ের ইচ্ছেকে সামনে রেখে আল-আমীনে পড়াবার সিদ্ধান্ত নেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে সাইদা আল-আমীনে পড়ার স্বপ্নকে সফল করে তোলে।

সাইদার আব্বা আতাউর রহমান উচ্চ-মাধ্যমিক পাস। নিজেদের বিঘে চারেক জমিতে ধান, ভুট্টা প্রভৃতি চাষ করে সংসার নির্বাহ করেন। তাঁর স্ত্রী হাসমোতারা খাতুন উচ্চ-মাধ্যমিক পাস, পেশায় প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা। সাইদার ছোটোবোন আইরা শিশু ও ভাই সাহিন দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। একাদশ শ্রেণিতে মিশনের উলুবেড়িয়া শাখায় সাইদার পড়াশোনা শুরু এবং ২০২৩-এ উচ্চ-মাধ্যমিকে ৯০ শতাংশ নম্বর অর্জন করে। ওই বছর নিটে পায় ৩৩১ নম্বর। কোচিং নেওয়া শুরু করে মিশনের সাঁতরাগাছি ক্যাম্পাসে। পার্টটেস্ট, মকটেস্টের পাশাপাশি ফ্যাকাল্টিদের পড়ানো ও ডাউট ক্লিয়ারিং প্রভৃতির মাধ্যমে নিজের দুর্বল জায়গাগুলোকে অতিক্রম করতে থাকে। এক বছর পরিশ্রমের মাধ্যমে ২০২৪-এ নিটে তার প্রাপ্ত নম্বর ৫৯১। মনে মনে কষ্ট পেলেও সিদ্ধান্ত নেয়— ইনশা আল্লাহ্ আগামী বছর সফল হব।

এরই মাঝে সে চলে আসে মিশনের অঙ্কুরহাটি শাখায়। এখানকার শান্ত শিষ্ট পরিবেশ, অপেক্ষাকৃত কম স্টুডেন্ট এবং অধিকাংশই রিপিটার তার পছন্দের। গতবছরের খামতিগুলোকে ভরাট করার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকাশনীর বই থেকে এমসিকিউ অনুশীলনে বাবলিং মিস্টেককে একেবারে মিনিমাম করার চেষ্টায় রত থাকে। তারপর এল ২০২৫-এর ৪ মে নিট পরীক্ষা। হল থেকে বের হলে, উজ্জ্বল মুখায়বেই বোঝা যাচ্ছিল সাইদার সাফল্যের সম্ভাবনা। ১৪ জুন রেজাল্ট হলে সাইদা ৩২৮৫২ র‍্যাঙ্ক করে ছোটোবেলার স্বপ্ন পূরণ করে ফেলে। আব্বা মা-সহ এলাকায় খুশির খবরের উদ্‌যাপন শুরু হয়। কারণ, সাইদা ওই গ্রামের প্রথম মেয়ে, যে মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস. পড়তে চলেছে। কম বয়সে মেয়েদের বিয়ের পক্ষপাতী পরিবারও সাহস করে তাঁদের মেয়েদের বলতে শুরু করেন, “তোমাদেরকেও সাইদার মতো ডাক্তার হতে হবে।”

সাইদার ভবিষ্যতের ইচ্ছে গাইনোকোলোজি নিয়ে এম.ডি. করার, কারণ, গ্রামীণ মহিলারা সংকোচে তাঁদের বহু শারীরিক সমস্যা লুকিয়ে রাখেন। ছোটো থেকেই মা-বোনদের সমস্যার কথা শুনেও চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন সে দেখেছে। বিশেষত সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের মহিলাদের রোগ থেকে মুক্ত করার মিশন, এখন থেকেই মনে গেঁথে নিয়েছে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস.-এর প্রথম বর্ষের ছাত্রী সাইদা পারভীন। অবসর সময়ে তার প্রিয় কাজ কবিতা লেখা ও গান শোনা। ■

নওশিন বিন্তি

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৩৪০০১

ডায়মন্ড হারবার গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

Its Environment is perfect for any student who want to study. Teachers are also very helpful and supportive.— আল-আমীন মিশন নিয়ে এই অভিমত এক ছাত্রীর। ছাত্রীটি আল-আমীনের খলতপুর শাখায় ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়। এখান থেকেই ২০২০ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৫.৭ এবং ২০২২ সালে উচ্চ-মাধ্যমিকে ৯৩.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করে। মিশন থেকে সে ফিরে আসে। রানিং বর্ষে নিটে খুব একটা সুবিধে করতে পারেনি। বাড়ি থেকেই যাতায়াত করে কলকাতার এক নামকরা কোচিং প্রতিষ্ঠানে নিটের প্রস্তুতি নিয়ে ২০২৩-এ নিটে তার অর্জন ৩১৭ নম্বর। এই রেজাল্টে সে খুশি হতে পারেনি। বাড়িতে থেকেই অনলাইনে কোচিং নিয়ে নিটে বসে ২০২৪ সালে। গতবছরের থেকে অনেক বেশি, অর্থাৎ ৫৮০ নম্বর পায়। কিন্তু এতেও কাট অব মার্কস থেকে বেশ দূরেই রয়ে যায়। আব্বা, মায়ের সঙ্গে ছাত্রীটিও কিছুটা ভেঙে পড়ে। এই প্রেক্ষিতে নিটের প্রস্তুতি নিতে ২০২৫-এর জুন মাসে আল-আমীন মিশনের সাঁতরাগাছি ক্যাম্পাসে চলে যায় সে। এখানে গিয়েই পুরো বছরের পরিকল্পনা সাজিয়ে নেয় মনে মনে। শুরু করে নিটে সফল হওয়ার লড়াই। দক্ষ ফ্যাকাল্টিদের পড়ানো, হালকা ও কঠিন উভয় ধরনের প্রশ্নের সমাধানে গুরুত্বারোপের ওপরও জোর দেয়। ২০২৫-এর নিটের ফল প্রকাশ পেলে তার নামের পাশে দেখা যায় প্রাপ্ত নম্বর ৫১৮। এর অর্থ নিটে তার পরিশ্রম সাফল্য এনে দিয়েছে। সে এখন এম.বি.বি.এস.-এর পড়ুয়া। তার নাম নওশিন বিন্তি।

উত্তর চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত রাজারহাট থানার চাঁদপুরের মহম্মদ সাইমুর রহমান বাণিজ্যে স্নাতক। তিনি সাইবার ক্যাফে চালিয়ে সংসার নির্বাহ করেন। মাধ্যমিক পাস গৃহকর্ত্রী সাকিলা খাতুন তাঁর স্ত্রী। তাঁদেরই মেধাবী কন্যা নওশিন। আরেক কন্যা শামা সাদিয়া উচ্চ-মাধ্যমিক ও পুত্র ফারদিন চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। নওশিনের ফুফুর ইঞ্জিনিয়ার ছেলেও আল-আমীনের প্রাক্তনী। তাঁর কাছ থেকেই মিশনের খবর পেয়ে নওশিনকে মিশনে ভর্তি করান তার আব্বা-মা। নওশিনের সাফল্যে পরিবার প্রতিবেশী সকলেই খুশি। ছাত্রী হিসেবে নওশিন এই গ্রামের প্রথম, যে মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস. পড়ছে। নওশিনের ইচ্ছে এম.বি.বি.এস. করার পরে স্নায়ুবিদ্যা নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের। এ ছাড়াও গ্রামের দুঃস্থজনের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্যে সপ্তাহে বা দু-সপ্তাহে একদিন বরাদ্দ রাখতে ইচ্ছুক নওশিন। সংখ্যালঘু সমাজ অধ্যুষিত এই জনপদে বেশিরভাগ মানুষ ছোটোখাটো ব্যাবসা এবং কায়িক শ্রমেই নিয়োজিত। শিক্ষার হার ও সচেতনতা বেশ কম। নওশিনের এই সাফল্য এলাকাবাসীর মধ্যে আল-আমীনে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানোর আগ্রহ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

মাধ্যমিক পর্যন্ত বেশ কিছু বাংলা গল্প উপন্যাস পড়ে ফেলেছিল নওশিন। তার পরে একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিষয়ের টিউশন ও স্কুলের পড়াশোনার চাপে সেভাবে পড়তে না পারলেও সেই ইচ্ছে এখনও তার অটুট। সাহসী মহাকাশচারী প্রয়াত কল্পনা চাওলা তার অন্যতম প্রিয় ভারতীয়। বাংলায় প্রান্তিক সমাজে শিক্ষা আন্দোলনের সফল অগ্রদূত আল-আমীনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম তার অন্যতম প্রিয় বাঙালি ব্যক্তিত্ব। তার সাফল্যে আব্বা-মা ছাড়াও আল-আমীন মিশন, সাঁতরাগাছি শাখার ইনচার্জ মহিউল হক স্যারের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। ■

কুলসুম খাতুন

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৩৪০২৯

নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

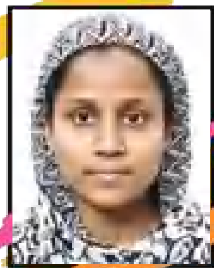

২০১৯ সালের উচ্চ-মাধ্যমিকে তার প্রাপ্ত নম্বর ৭৫.৪ শতাংশ। ২০২০-তে আল-আমীনের বারুইপুর শাখায় কোচিং নিয়ে নিট পরীক্ষায় ৩০০ নম্বরের একটু বেশি পায়। শুরু হয় করোনার লকডাউন। স্মার্ট ফোন না থাকায় অনলাইনে পড়াশোনার সুযোগও সেভাবে পায়নি। ২০২১-এ নিটে তার প্রাপ্ত নম্বর ৪২০। ওই বছরের মাঝের দিকে টি.বি. ও কিডনি-স্টোন ধরা পড়ে। তার পক্ষে এম.বি.বি.এস. পড়া আর সম্ভব নয় ভেবে আব্বা-মা বি.এসসি. নার্সিঙে ভর্তি করে দেন। চিকিৎসার কারণে ২০২২-এর পুরোটা এবং ২০২৩-এর বেশ কিছুটা সময় চলে যায়। ২০২৩-এর অবশিষ্ট সময়ে স্থানীয় একটি মেসে অনলাইনে ক্লাস করে ৫৫৬ নম্বর আসে তার। ২০২৪-এ আবার বারুইপুর শাখায় ফিরে আসে, শুরু করে পড়াশোনা। ২০২৪-এ কাট অব মার্কসের কাছাকাছি ৬১৯ নম্বর পেলেও হয়নি আশানুরূপ ফল। ফলে নর্থ বেঙ্গল ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে বি.ডি.এস.-এ ভর্তি হয়ে ক্লাস শুরু করে দেয়। এর পরেও সে স্বপ্ন দেখত এম.বি.বি.এস. পড়ার।

অভিভাবকের অনুমতিতে ২০২৪-এর ডিসেম্বরে বারুইপুরের হস্টেলে আবার হাজির হয়ে পুরোদমেই নিটের প্রস্তুতি শুরু করে। এরই মাঝে পায়ের সমস্যা দেখা দিলে পায়ের অপারেশনও করাতে হয়। অপারেশনের পরে বাড়ি না গিয়ে ফিরে আসে মিশনের হস্টেলে। এখানে একদিকে চলে সেবাশুশ্রূষা এবং অন্য দিকে চলে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজিকে গুলে খাওয়া। ২০২৫-এর ১৪ জুন নিট (ইউজি) রেজাল্ট প্রকাশিত হলে তার নামের পাশে জ্বলজ্বল করে সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৩৪০২৯। অর্থাৎ, বি.এসসি. নার্সিং কিংবা বি.ডি.এস. নয়, সরকারি মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস. পড়ার স্বপ্ন পূরণ করে ফেলে। লড়াকু সেই ছাত্রী কুলসুম খাতুন। মালদা জেলার মোথাবাড়ি থানার পালুটোলা গ্রামের সন্তান। স্থানীয় হাই স্কুল থেকে ২০১৭ সালে মাধ্যমিকে ৭৮ শতাংশ নম্বর পাওয়ার পরে একাদশ শ্রেণিতে মিশনের চাপড়া শাখায় ভর্তি হয়।

কুলসুমের ফুফুকে কলকাতার পিজি হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে আনা হয়। সেই সময় তার আব্বা কুলসুম ও তার দিদিকে বলেছিলেন, দু-জনের মধ্যে একজন যেন চিকিৎসক হয়। প্রায় এক দশক আগেই এভাবেই কুলসুমের মনে গেঁথে যায় সে-কথা। সঙ্গে জুড়ে যায় পাশের গ্রামের দাদাদের আল-আমীন থেকে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাওয়ার কথা শুনে উদবুদ্ধ হওয়া। কুলসুমের আব্বা গোলাম মোস্তফা মুম্বাইয়ে ফলের দোকানের কর্মচারী। মা বুবিনুর বিবি বিড়িশ্রমিক। উভয়ের পড়াশোনা নবম শ্রেণি পর্যন্ত। বাড়িতে থাকলে মেজোসন্তান কুলসুম তার মাকে বিড়ি বাঁধার কাজে সহায়তা করে। প্রান্তিক ভূমিহীন পরিবারে কুলসুমের বিবাহিতা এক দিদি ও পাঁচ বোন। দিদি ফাতেমা দ্বাদশ শ্রেণি পাস, যায়নাব নার্সিঙে, রোকেয়া কলেজে প্রথম বর্ষের, হালিমা দশম শ্রেণির ও মারিয়ম প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রী।

কুলসুম জানায়, তার অপারেশনের পরে হস্টেলে সকলের কাছ থেকে যেভাবে পারিবারিক ভালোবাসা ও পরিষেবা পেয়েছে, সেটা আল-আমীন মিশন বলেই সম্ভব। এ ছাড়া নামমাত্র মাসিক বেতনে নিটের কোচিঙের সুযোগ দেওয়ার জন্যে মিশনের সেক্রেটারি স্যার এম নুরুল ইসলামের প্রতি তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। বারুইপুর শাখার ইনচার্জ স্যার, রুশিয়া আপা, আয়েশা আপা, জিন্না আপা, ডাইনিং স্টাফ, রুমমেট-সহ সকলের অবদানেই তার এই সাফল্য। ■

সালমা রহমান

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৩৪৩২৪

ডায়মন্ড হারবার গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

চতুর্থ শ্রেণি উত্তীর্ণ এক শিশু ঘরবাড়ি ও পরিচিত বন্ধুবান্ধব ছেড়ে পঞ্চম শ্রেণিতে হস্টেলে থাকা শুরু করেন। উচ্চ-মাধ্যমিকের এবং এক বছর নিটের কোচিং মিলিয়ে প্রায় এক দশক হস্টেলে কাটান। হস্টেলটি আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখার। আরও এক বছর মিশনের সূর্যপুর ক্যাম্পাসে থেকে নিটে সাফল্য পেয়ে তিনি একজন দন্ত চিকিৎসক। নাম মাহফিজুর রহমান। উত্তর চব্বিশ পরগনার ইকোপার্ক থানার হাতিয়াড়া গ্রামে তাঁদের আবাসস্থল। দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সালমা রহমানও পঞ্চম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত খলতপুরের হস্টেলে কাটিয়েছে। পরে নিটের কোচিং নিয়েছে মিশনের সাঁতরাগাছি ও অঙ্কুরহাটি শাখায়। এখন সে ডায়মন্ড হারবার গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস.-এর প্রথম বর্ষের ছাত্রী।

তার আব্বা হাফিজুর রহমান বিজ্ঞানের স্নাতক। বেসরকারি অফিসের কর্মচারী। উচ্চ-মাধ্যমিক উত্তীর্ণা মা সামসুন নাহার গৃহকর্ত্রী। আরেক জন দাদা মুস্তাফিজুর গ্র্যাজুয়েট, চাকুরিজীবী। পিতার ইচ্ছে ছিল সন্তানদের মধ্যে একজন বি.ডি.এস. এবং অন্য জন এম.বি.বি.এস. চিকিৎসক হোক। দাদা বি.ডি.এস. হয়ে যাওয়ায় সালমাকেই বাবার প্রত্যাশা পূরণ করতে হল। ২০১৯ ও ২০২১ সালে খলতপুর শাখা থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সালমা যথাক্রমে ৯০ ও ৯৫ শতাংশ নম্বর পায়। রানিং বর্ষে সালমা নিটে ২৭৪ নম্বর পাওয়ার পরে স্বপ্ন পূরণের যাত্রা শুরু করে মিশনের সাঁতরাগাছি ক্যাম্পাসে। ২০২২-এ ৪৩২ নম্বর নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ২০২৩-এ শাখা পরিবর্তন করে সালমা চলে আসে অঙ্কুরহাটি। ভালো প্রস্তুতিও নিয়েছিল, কিন্তু টেনশন ও শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে তার প্রাপ্ত নম্বর হয় ৫১২। ২০২৪-এ সালমা বাড়িতে থেকেই নিটের প্রস্তুতি নিয়ে ৬১১ নম্বর পেয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আসলে নিট পরীক্ষার মাত্র একদিন আগে সালমার নানা ইন্তেকাল করেন।

অভিভাবকরা সালমাকে ক্যালকাটা হোমিয়োপ্যাথি মেজিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে ভর্তি করে দেন। সালমা কিন্তু সেখানে ক্লাস করার সঙ্গে নিটের পড়াশোনাও চালিয়ে যায়। কিছু দিন ক্লাস করার পরে সালমা বুঝতে পারে একসঙ্গে দুটো দিক চালিয়ে যাওয়া খুবই চাপের। ওই বছরের নভেম্বর মাসে সালমা অঙ্কুরহাটি পৌঁছে নতুন উদ্যমে পড়াশোনা চালায়। প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ, গ্রুপ স্টাডি, ফ্যাকাল্টিদের বিষয়ভিত্তিক টিচিং ও মানসিকভাবে সহায়তায় সালমার সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক হয় ৩৪৩২৪। আব্বা, মা, দাদাদের স্বপ্ন পূরণ করে এম.বি.বি.এস.-এ সুযোগ পাওয়া সে এলাকার প্রথম ছাত্রী হয়ে ওঠে। সালমার দাদার সাফল্যে জনপদে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে আল-আমীনের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। বোনের সাফল্য সেই সুনামে নতুন মাত্রা যোগ করে।

সালমা জানায়, "আগের বার ৬১১ নম্বর পেয়ে যখন স্বপ্নের দোরগোড়া থেকে ফিরে আসতে হয়, তখন আমি হতাশ হয়ে পড়ি, পুনরায় লড়ার আর ইচ্ছে ছিল না। উনসানির কবীর স্যার এবং নয়াবাজ সার্কলের সুপার মহিউল স্যার ও অঙ্কুরহাটির ইনচার্জ কিবরীয়া স্যারদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁরা নতুন করে উৎসাহ না দিলে আমার এই সাফল্য অর্জন করা হত না।" সালমা ভবিষ্যতে স্নায়ুরোগ বিষয়ে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী। এলাকার দুঃস্থ মানুষদের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে সালমা এখন থেকেই মনস্থির করে ফেলেছে। ■

নার্গিস পারভীন

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৩৫০৮৪

ডায়মন্ড হারবার গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

মহম্মদ আলিম ঘরামী প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তিনি ইংরেজির সাম্মানিক স্নাতক। অভিভাবকগণের অনুরোধে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এক বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত করেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি হল আল-আমীন মিশন। ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী নার্গিস পারভীন তার শিক্ষক বাবার কাছে জেদ ধরে যে, সেও সেখানে পড়বে। নার্গিস প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসে এবং পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়। সপ্তম শ্রেণিতে মিশনের খলতপুর শাখায় তাকে ভর্তি করা হয়। খলতপুর থেকেই ২০২০-তে মাধ্যমিক ও ২০২২-এ উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় যথাক্রমে ৯২.৮ ও ৯৫.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে সে পাস করে। নার্গিসের উচ্চ-মাধ্যমিক পাস মা রাকিবা সবনম ঘরামী গৃহকর্ত্রী। তার একমাত্র ভাই রাহি আবরার সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। ঘরামী পরিবারের বসতবাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুর থানার রাজগড়া গ্রামে।

উচ্চ-মাধ্যমিকের বছরই নিট পরীক্ষায় বসে নার্গিস পায় ১৩৯ নম্বর। অভিভাবক ও নার্গিস উভয়েরই সিদ্ধান্তে কলকাতার এক নামকরা কোচিং প্রতিষ্ঠানে নিটের কোচিং নিতে শুরু করে। এক বছরের কোচিং কোর্স শেষ করে ২০২৩ সালে নিট পরীক্ষা দেয়। তার প্রাপ্ত নম্বর ২৬৫। রেজাল্টে কিছুটা ভেঙে পড়ে নার্গিস। নতুন করে বড়ো কোনো কিছুর জন্যেই মনকে স্থির করতে পারছিল না। এই পরিস্থিতিতে আব্বা, মা এবং মিশনের বন্ধুরা নার্গিসকে পুনরায় মিশনে ভর্তি হতে উৎসাহিত করে। উলুবেড়িয়া ক্যাম্পাসে শুরু করে নিটের লড়াই। সাফল্য না এলেও ২০২৪-এ গতবছরের ২৬৫-র দ্বিগুণের বেশি, ৫৪৯ নম্বর পেয়ে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে ওঠে।

উলুবেড়িয়া থেকে তুলনায় ছোটো শাখা অঙ্কুরহাটিতে চলে আসে নার্গিস। এখানকার পরিবেশ, সেলফ স্টাডির অফুরন্ত ব্যবস্থা এবং শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত স্যার ও ম্যাডামের ইমোশনাল বন্ধনে নার্গিস সাফল্যের বিষয়ে নিশ্চিত হয়। ২০২৫-এর নিটের রেজাল্ট প্রকাশ হলে নার্গিসের সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক হয় ৩৫০৮৪। অর্থাৎ, এই র‍্যাঙ্কে সরকারি মেডিকেল কলেজে তার এম.বি.বি.এস. পড়া নিশ্চিত। খুশির সংবাদে পরিবারের পাশাপাশি আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীদের মাঝে সাড়া পড়ে যায়। আল-আমীন মিশনের ছাত্রীর সুখ্যাতিতে বহু শ্রমজীবীর পরিবারও ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহী ও সচেতন হয়ে উঠছেন।

প্রায় সমান সমান হিন্দু ও মুসলমানের বসতি রাজগড়া গ্রামে। সেই গ্রামের প্রথম এম.বি.বি.এস. পড়ুয়া নার্গিসের ইচ্ছে ভবিষ্যতে স্ত্রীরোগ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ। স্বাস্থ্য বিষয়ে মহিলাদের সচেতন করতেই নার্গিসের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হওয়ার ইচ্ছে। নার্গিস জানায়, এই কাজের জন্যে সপ্তাহে একটা দিন নির্দিষ্ট থাকবে, যেখানে দুঃস্থ ও নিঃস্ব মানুষেরা নিখরচায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে পারবেন। ছোটো থেকেই নার্গিস আর্ট ও ক্রাফটের ভক্ত। অবসরে একটু-আধটু ব্যাডমিন্টন খেলতে ভালোবাসে। নার্গিসের মতে, পড়াশোনার পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা, অভিজ্ঞ ফ্যাকাল্টি ও গ্রুপ স্টাডির কারণে নিট কোচিঙের জন্যে আল-আমীনই সেরা প্রতিষ্ঠান। তার প্রত্যাশা, মিশনের নিট ক্যাম্পাসে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রির জটিল বিষয়গুলোকে গ্রাফিক্স ও ভিডিয়োগ্রাফির মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা হোক। ■

হাদিমুল হক

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৩৬৪৫৬

রায়গঞ্জ গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

২০২৫ সাল হাদিমুল হকের জন্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই বছরে সে দু-দু-টো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় বসেছিল। একটি রাজ্যের উচ্চ-মাধ্যমিক এবং অপরটি এনটিএ পরিচালিত সর্বভারতীয় নিট (ইউজি) পরীক্ষা। প্রথমটিতে সে ৯৬.৪ শতাংশ এবং দ্বিতীয়টিতে ৭১.৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে দ্বিতীয়টির রেজাল্ট তুলনায় খারাপ মনে হলেও এই রেজাল্টই তার এবং তার পরিবারের জীবন বদলাতে সহায়ক হয়েছে।

হাদিমুলের আব্বা এনামুল হক নিজেদের বিঘে দুয়েক জমিতে কৃষিকাজ করেই সংসার চালান। মা আম্মারা গৃহকর্ত্রী। উভয়ের লেখাপড়া ক্লাস এইট পর্যন্ত। ২০১৯ সাল। হাদিমুল তখন ক্লাস সেভেনের ছাত্র। ওই বছরই তার আব্বা তাদেরকে এতিম করে ইন্তেকাল করেন। খবর শুনে দুই দাদা এবং হাদিমুলকে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তার মা। মুহূর্তেই ঘর পরিচালনা থেকে তিন সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে আল্লাহ্র ওপর ভরসা করা ছাড়া আর-কোনোকিছুই চোখের সামনে দেখা মিলছিল না। ধীরে ধীরে আত্মীয়স্বজনের সাহসের ওপর ভর করে সামনের দিকে এগোবার ভরসা পান তিনি। আজ ছয় বছর পরে পরিবারের বড়োছেলে আলমগির এম.এ. পড়ছেন, মেজো নাজিম স্নাতক হয়েছেন।

ছোটো হাদিমুল স্থানীয় স্কুলে প্রাইমারি পর্যায়ের পড়াশোনার পরে বেসরকারি বৈরগাছি জে এ শিক্ষা মিশনে ভর্তি হয়। এখান থেকেই ২০২৩ সালে ৯৪.৪ শতাংশ নম্বর নিয়ে মাধ্যমিক পাস করে। উত্তম রেজাল্ট করে হাদিমুল, বিশেষ করে মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে। তার মা ও দাদারা উদ্যোগী হয়ে হাদিমুলকে আল-আমীন মিশনে ভর্তি করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে খুবই কম মাসিক বেতনে মিশনের মূল শাখা খলতপুরে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়। ২০২৫ সালে ৯৬.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে এই শাখা থেকেই উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করে। রাজ্য স্তরের মেধা-তালিকার প্রথম কুড়িতে তার স্থান ষোলোতম। উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার পর পরই নিট (ইউজি) পরীক্ষাও দেয় হাদিমুল, রেজাল্ট প্রকাশ হলে হাদিমুল ৫১৫ নম্বর পেয়ে সরকারি মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস. পড়ার জায়গা নিশ্চিত করে ফেলে। মালদা জেলার গাজোল থানার বৈরগাছি গ্রামের হাদিমুল তার মা, দাদা ও আত্মীয়স্বজনকে এই রেজাল্টের খুশিতে কাঁদিয়ে দেয়। উচ্চ-মাধ্যমিকের সঙ্গে নিট ক্র্যাক করা সহজ নয়। সেই অসাধ্যসাধনই করে ফেলেছে আম্মারার স্নেহের হাদিমুল। ইতোমধ্যেই তাদের গ্রামের দু-জন মেয়ে এবং এক জন ছেলে মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস. পড়ছে। হাদিমুল সেই তালিকায় চতুর্থ জন। চার জনই আল-আমীনে পড়ে এই সাফল্য অর্জন করেছে।

হাদিমুল খুব মন দিয়েই পড়াশোনা করে এম.বি.বি.এস.-এ ভালো রেজাল্ট করতে আগ্রহী। পরবর্তী সময়ে চিকিৎসাবিদ্যার ডিগ্রি অর্জন নিয়ে এখনই ভাবিত নয় সে। তার মতে, চিকিৎসকরাই মানুষের সেবার কাজ সবচেয়ে বেশি সূক্ষ্মতার সঙ্গে করতে পারে। সেও এই কাজে অংশী হবে, তবে এখনই ওইসব নিয়ে কিছুই ভাবছে না। এই সাফল্যে তার পরিবার, বিশেষ করে তার মায়ের অবদান সর্বাধিক। তিনি ছেলের সাফল্যের খবর শুনে বলে ওঠেন— সাবাশ, বেটা! এ ছাড়াও আল-আমীনের মুখ্য অবদান চিরকালই মনে থাকবে। মিশন সুপারভাইজার সেখ মারুফ আজম স্যারের নজরদারি এবং ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত অন্যান্য স্যারেদের সহায়ক ভূমিকাও অনস্বীকার্য। ■

নিশাত নাজিফা

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৩৭৬২৩

মালদা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

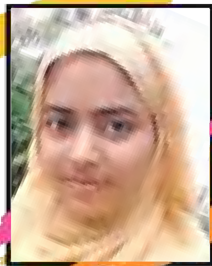

তাদের এলাকায় লোকমুখে ঘোরে এ-কথা, পেটে আল-আমীনের ভাত থাকতেই হবে, তবেই সাফল্য আসবে। আবার কেউ কেউ এ-কথাও বলে বেড়ান, আল-আমীনে গেলেই ডাক্তার হওয়া সম্ভব। জনপদটি মালদা জেলার ইংলিশবাজার থানার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বুধিয়া গ্রাম। জনশ্রুতিগুলি আমাদের শোনাল নিশাত নাজিফা। ২০২৫-এ নিট পরীক্ষায় সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৩৭৬২৩ করে উপরোক্ত কথাকে নিজের জীবনেও সত্যি করে দিল নাজিফা। তার বাবা মহ. মহিদুর রহমানের পড়াশোনা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। পেশা ভাগচাষ। উচ্চ-মাধ্যমিক পাস মা নাদিরা খাতুন কষ্টের সংসারের দক্ষ পরিচালক। নাজিফার একমাত্র ভাই নিশার বিজ্ঞান নিয়ে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ছে।

গ্রামের বুধিয়া হাই মাদ্রাসা থেকে নাজিফা ২০১৮ সালে ৮৯.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা পাস করে। এই মাদ্রাসার এক শিক্ষক, যিনি আল-আমীনেরও প্রাক্তন শিক্ষক, মেধাবী নাজিফাকে মিশনে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি করতে সর্বতোভাবে সহায়তা করেন। নাজিফা বুধিয়া গ্রামের বন্ধুবান্ধব ও পরিবার ছেড়ে চলে আসে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া ক্যাম্পাসে আল-আমীন পরিবারে। ২০২০-তে এখান থেকেই উচ্চ-মাধ্যমিকে ৮৭.৪ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাস করে। ছোটোবেলা থেকেই নাজিফার স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হওয়ার। সেই স্বপ্নকে সাকার করতেই তার আল-আমীনে আসা। সে-কারণে উচ্চ-মাধ্যমিকের সঙ্গে নিট পরীক্ষায়ও বসেছিল নাজিফা। পেয়েছিল ২০০ নম্বরের একটু বেশি।

পরের বছর শুরু হয় করোনার প্রকোপে লকডাউন। মাস দুয়েক খলতপুর শাখায় কোচিঙের পরে বাড়ি ফিরে আসে। অনলাইন কোচিং ও ইউটিউবের সহায়তায় বাড়িতে থেকে ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩-এ নিটে তার প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে ৩৮৫, ৪০০ ও ৪৯৮। কঠোর পরিশ্রমের পরেও সাফল্য না আসায় নাজিফা মনস্থির করে আবার মিশনে ফিরে যাবে। কিন্তু করোনার পরে তার বাবার আর্থিক অবস্থা আগের থেকে আরও খারাপ হয়ে যায়। মিশনের বেতনের প্রশ্নে নাজিফা দুশ্চিন্তায় পড়ে। তবুও মেয়ের ইচ্ছেতে বাবা রাজি হন এবং মিশন কর্তৃপক্ষ ক্লাস ইলেভেনের দুই তৃতীয়াংশ ছাড়ের সেই পুরোনো বেতনেই তাকে ভর্তি করে নেয়। এ-বারে তার স্থান হয় অঙ্কুরহাটি শাখায়। মিশনের হস্টেলের অতুলনীয় পড়াশোনার ব্যবস্থাপনা ও অদম্য চেষ্টায় ২০২৪-এ তার প্রাপ্ত নম্বর ৬১০। সাফল্যের বেশ কাছে এসেও কাট অব মার্কস থেকে কিছুটা দূরে রয়ে যায় নাজিফা।

এই রেজাল্টে একটু মুষড়ে পড়লেও আবার নতুন পরিকল্পনায় পড়াশোনা শুরু করে নাজিফা। ফলে ২০২৫-এর নিটের রেজাল্ট বের হলে নাজিফার আব্বা-মা খুশিতে কেঁদে ফেলেন। আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশীরা নাজিফাকে শুভেচ্ছা ও দোয়ায় ভরিয়ে দেন। নাজিফা পেয়েছে ৫১৪ নম্বর। তার ইচ্ছে এম.বি.বি.এস.-এর পরে গাইনোকোলজিস্ট হওয়ার। কারণ, তাদের এলাকায় এখনও সচেতনতার অভাবে প্রসূতির মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। নাজিফা জানায়, "আমাদের আর্থিক অবস্থা অত ভালো নয়। অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীর মতো পূর্ণবেতনে আমার বাবা আমাকে কখনোই পড়াতে পারত না। আমি যখন একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হই তখন খুব কম বেতনে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। তা না হলে ডাক্তারি পড়ার স্বপ্ন কোনোদিন পূর্ণ হত না। আমার সাফল্যের পেছনে বাবা-মায়ের দোয়া, অঙ্কুরহাটি শাখার ব্যবস্থাপনা এবং মিশন পরিবারের অবদান অনস্বীকার্য।" ■

শুকতারা খাতুন

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৩৮৯২৬

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

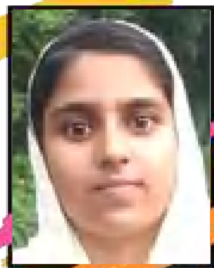

উত্তর দিনাজপুর জেলার কামারতোর হাই স্কুলে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছে শুকতারা খাতুন। জাতীয় শিশুশ্রমিক প্রকল্প স্কুলের মতো হাই স্কুলেও প্রত্যেক ক্লাসেই ফার্স্ট হত শুকতারা। ২০২১ সালে ৯২.৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। শুকতারার রেজাল্টে চিন্তায় পড়ে যায় পরিবার। মেয়েকে সায়েন্স নিয়ে পড়াবে কোথায়? ভালো স্কুল ও টিউশনের বড়োই সমস্যা। এ ছাড়া হস্টেলে রেখে যদি পড়ানো যায়, তার খরচাইবা কীভাবে বহন করবেন? শেষমেষ শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শে শুকতারাকে আল-আমীন মিশনে ভর্তির সিদ্ধান্ত হয়। পরিবারের আর্থিক অবস্থা দুর্বল থাকায় মিশন কর্তৃপক্ষ খুবই কম মাসিক বেতনে মেধাবী শুকতারাকে মালদহ শাখায় ভর্তি করে নেন। শুকতারার আব্বা রেহেসান আলি তাঁদের বিঘে তিনেক জমিতে কৃষিকাজ করেই সংসার নির্বাহ করেন। তার মা কামিরন নেসা ঘরের পরিচালক। উভয়ের পড়াশোনা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। বিবাহিত দিদি সাজনুর আর্টসে স্নাতকোত্তর। দাদা সালমান পদার্থবিদ্যায় সাম্মানিক স্নাতকের ছাত্র। ছোটোভাই মাতিন উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করে নিটের কোচিং নিচ্ছে। উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি থানার কামারতোর গ্রামই তাদের আবাসস্থল।

বাড়ি থেকে দূরে মিশনের হস্টেলে শুকতারা প্রথম থেকেই পূর্ণ-উদ্যমে পড়াশোনায় ডুবে যায়। পরিশ্রমের ফল হিসেবে ২০২৩-এ উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত নম্বর হয় ৮৪.১ শতাংশ। ছোটোবেলা বা হাই স্কুলে পড়ার সময়ও শুকতারা চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখেনি। কিন্তু, মিশনে আসার পরেই সে উপলব্ধি করে প্রত্যেক বছর অনেকেই নিট পরীক্ষায় পাস করে এম.বি.বি.এস. বা বি.ডি.এস. পড়তে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়। সেই সূত্রে শুকতারাও নিটের কোচিং নিতে ভর্তি হয় মিশনের বারুইপুর শাখায়। ২০২৩-এ উচ্চ-মাধ্যমিকের বছর নিটের বিনা কোচিঙে শুকতারা পায় ১৭৩ নম্বর। এক বছর কোচিং নিয়ে ২০২৪-এ নিটে ৫৭৬ নম্বর পেলেও সাফল্য আসেনি। সামান্য একটু আশাহত হলেও শুকতারা দমে না গিয়ে নতুন করে নিটের প্রস্তুতিতে জোর দেয়। ফলস্বরূপ এ-বছর তার সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক হয় ৩৮৯২৬। সে এখন জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস.-এর ছাত্রী।

রেজাল্ট প্রকাশিত হলে শুকতারার পরিবার ও আত্মীস্বজন সেভাবে খুশিতে মাততে পারেননি। কারণ, শুকতারা জানায়, তার অর্জিত ৫১২ মার্কস বর্ডার লাইনে ছিল। মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে এলাকায় প্রবল উচ্ছ্বাসের বাতাস বইতে শুরু করেছে। কামারতোর গ্রামের দীর্ঘকালীন শূন্যতাকে অতিক্রম করে শুকতারা হয়ে উঠেছে সেই গ্রামের প্রথম এম.বি.বি.এস. পড়ুয়া। কৃতজ্ঞ শুকতারা জানায়, "মিশন পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। মিশনে না গেলে আমি ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারতাম না। আমার বয়সি বাকিদের মতো আমাকেও ঘরসংসার সামলাতে হত।" শুকতারা বলে, মাধ্যমিকে তার সহপাঠীদের মধ্যে এক জনও বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করেনি। কারণ, গ্রামে সায়েন্স পড়ার সেরকম সুযোগ নেই। ভবিষ্যতে সে একজন দক্ষ গাইনোকোলোজিক্যাল সার্জন হতে ইচ্ছুক। গ্রামীণ মহিলাদের স্বাস্থ্য সচেতনতার পাশাপাশি দুঃস্থ মা-বোনদের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে আগ্রহী। আমরা জানি সকালের শুকতারারই অপর নাম সন্ধ্যাতারা। কামারতোর গ্রামের শুকতারাও এক সময় ডা. শুকতারা খাতুন হিসেবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চিকিৎসার মাধ্যমে মানবসমাজের সেবাকর্মে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। ■

নাজমা নাসরিন

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৩৮৯৫৬

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

গ্রামবাংলার অধিকাংশ পরিবার চলে গৃহকর্তার উপার্জনে। শিশুদের বয়স ৪ থেকে ৫ বছর কালে তাদের বাবার প্রয়াণ ঘটলে, সেই পরিবারের ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার মাধ্যমে বড়ো সাফল্যের পথ সংকুচিত বা অসম্ভব হয়ে পড়ে। মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা থানাধীন বালিপাড়া গ্রামের সেরকমই এক ব্যতিক্রমী পরিবারের কাহিনি বেশ চমকপ্রদ। পরিবারের কর্তা অয়জুদ্দিন ব্রেন স্ট্রোকে ইন্তেকাল করেন। সেই সময় নাজমা নাসরিন চার বছরের শিশু। বিয়ের পর থেকেই তার মা নাসিরা বিবি ঘরের কাজকর্মেই ব্যস্ত থাকতেন। তার পড়াশোনাও খুব বেশি নয়। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে প্রথম প্রথম ভেবেই পাননি কীভাবে ছোটো ছোটো সন্তানদের মানুষ করবেন। প্রয়োজনের তাগিদে নাসিরা বিবি দর্জির কাজ শুরু করেন। নিজেদের বিঘে খানেক জমির স্বত্ব থেকেও সংসার নির্বাহ কিছুটা সহজ হয়। নানা-নানিও নাতি-নাতনিদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন।

তার মরহুম আব্বু নাজমার পড়াশোনা নিয়ে নিশ্চয় মনে মনে পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। কিন্তু, তিনি আজ নেই। সেই দায়িত্ব এখন পুরোটাই তার মায়ের ওপর এসে পড়েছে। নাজমা ধুলাউড়ি প্রাইমারি স্কুলের প্রত্যেক ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে। এর পরে স্থানীয় হাই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণিতে পড়াশোনা আরম্ভ করে। এক বছর পরে আল-আমীনে নাজমার পড়ার ইচ্ছে পূরণ হয়। আল-আমীন রেসিডেন্সিয়াল একাডেমি নওদা শাখায় ষষ্ঠ শ্রেণিতে শুরু করে লেখাপড়া। নওদা শাখা থেকেই ২০২২ সালে ৯১.১ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হয়। মিশনের ফরাক্কা শাখা থেকে ২০২৪-এ ৯৩.২ শতাংশ নম্বর নিয়ে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করে। নিটের কোচিং নিতে চলে আসে কলকাতায় মিশনের মহেশতলা শাখায়। দিনরাত এক করে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজির এনসিইআরটি-র বইগুলোর অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে। নাজমা ৫১২ নম্বর পেয়ে এ-বছরের নিটে তার স্বপ্ন পূরণ করে ফেলে। বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে খুশির সুগন্ধ। নাজমার মা খুশিতে মেয়েকে জড়িয়ে কাঁদতে থাকে। আনন্দের এই মুহূর্তে নাজমা তার আব্বাকে খুঁজতে থাকে। বলে ওঠে, “আমার আব্বু থাকলে আজ কতই-না আদর করতেন আমাকে।”

নাজমার আব্বা মরহুম অয়জুদ্দিন ছোটোখাটো ব্যাবসা করতেন। তিনি মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছিলেন। বর্তমানে তার দাদা সাকিল আনসারি ডিএমএলটি কোর্স করছেন। নাজমার বোন তসলিমাও এ-বছর এসএসকেএম মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে এম.বি.বি.এস. পড়তে। নাজমা ও তসলিমা দুই যমজ বোন। দু-জনের মধ্যে নাজমা বড়ো। ২০২৫-এ সফল নাজমা ও তসলিমাকে ধরলে, এখন পর্যন্ত এই গ্রামের মোট চার জন এম.বি.বি.এস. পাস করেছে বা বর্তমানে পড়ছে। উল্লেখের বিষয় এই চার জনই আল-আমীনের ছাত্র-ছাত্রী।

নাজমা ও তার মা এই সাফল্যে আল-আমীনের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। নাজমা জানায়, “আল-আমীনের শিক্ষায় আমি খুবই উপকৃত। আল-আমীনে দীর্ঘদিন পড়ার মাধ্যমে আমি ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছি। আমার এলাকার মানুষ আল-আমীনকে সম্মান করে, কারণ, এটি দরিদ্র ও মেধাবী পড়ুয়াদের স্বপ্ন পূরণে সাহায্য করে।” নাজমা স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যতে জেনারেল সার্জারিতে এম.এস. ডিগ্রি অর্জনের। এলাকার দুঃস্থ রোগীদের সুলভ মূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্যে সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট রাখতে তার প্রবল ইচ্ছে। ■

মহাবাতুন নেশা

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৩৯২২২

ই এস আই-পি জি আই এম এস আর, জোকা

মহাবাতুন নেশা সেসময় হয়তো পুরো ঘটনা ঠিক করে বুঝে উঠতে পারেনি। কারণ, তার বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর। সে দেখছে তাদের বাড়িতে বহু মানুষ এসেছেন এবং সকলেই কাঁদছেন। মা, দাদা, দিদিও কাঁদছেন। এটুকু বুঝতে পেরেছে তার আব্বা ইন্তেকাল করেছেন। মরহুম মহম্মদ মারফুল হক অন্যের জমিতে জল দেওয়ার কাজ করতেন। তার মা মুকরেমা বেওয়া বিড়ি বাঁধার কাজ করেন। কষ্টেশিষ্টেই সংসার চলত তাদের। কিন্তু, আব্বা চলে যাওয়ার পরে চার ভাই-বোনের পুরো দায়িত্বই মায়ের ওপর বর্তায়। ২০০৮ সালের সেই ঘটনা সে এখনও ভুলতে পারেনি। ই এস আই, জোকায় এম.বি.বি.এস. পড়তে ভর্তি হওয়ার সময় তার আব্বার কথা বার বার মনের পর্দায় ভেসে উঠছে।

মহাবাতুনের আব্বার অকালপ্রয়াণ পরিবারের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে। মালদা জেলার কালিয়াচক থানার নাসিরুদ্দিন বিশ্বাস টোলার মোস্তাফিজুর, মুসফেরা, মহাবাতুন ও নুরসেবার ভরণপোষণ এবং পড়াশোনা নিয়ে চিন্তায় পড়ে যান তাদের মা। মহাবাতুন প্রাইমারি স্কুল পেরিয়ে হাই স্কুলে ভর্তি হয়। এভাবেই ২০২০ সালে বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৪ শতাংশ নম্বরের অতুলনীয় রেজাল্ট সবাইকে অবাক করে দেয়। পুনরায় সাহস করে আল-আমীন মিশনের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসে এবং পাসও করে। এর আগে নবম শ্রেণিতেও ভর্তির পরীক্ষায় পাস করেছিল, কিন্তু ভর্তি হতে পারেনি। এ-বারে তাকে খলতপুর শাখায় একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি করে নেন সেক্রেটারি স্যার। মাসিক বেতন ছিল নামমাত্র, এক হাজার টাকারও কম।

খলতপুরের হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে ২০২২-এ উচ্চ-মাধ্যমিকে ৯৪ শতাংশ নম্বর পায়। বিনা প্রস্তুতিতে ওই বছর নিটে মহাবাতুন পায় ২১৮ নম্বর। শুরু করে খলতপুর শাখায় নিটের কোচিং। ২০২৩ ও ২০২৪-এ নিটে পায় যথাক্রমে ৫২৯ ও ৬১১ নম্বর। একটু হতাশ হয়ে সে চলে আসে মিশনের অঙ্কুরহাটি শাখায়। এখানে অধ্যয়নের নিরিবিলি পরিবেশ এবং শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত স্যার ও ম্যাডামের নজরদারিতে নিট প্রস্তুতিতে প্রাণিত হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ ৫১২ নম্বর পেয়ে মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস. পড়ার স্বপ্ন পূরণ করে ফেলে। খবর শুনে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান মুকরেমা বেওয়া। মহাবাতুনকে জড়িয়ে ধরে আনন্দাশ্রু আর থামেই না তাঁর।

মহাবাতুন তাদের গ্রামের চতুর্থ জন, যে মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস. পড়ার সুযোগ পেয়েছে। এর আগে দু-জন ছাত্র ও এক জন ছাত্রী এই সাফল্য অর্জন করেছে। চার জনই আল-আমীন মিশনের প্রাক্তনী। মহাবাতুন ভবিষ্যতে একজন গাইনোকোলজিস্ট হতে ইচ্ছুক। বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলাদের স্ত্রীরোগ ও হাইজিনিক সমস্যা থেকে মুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টায় আগ্রহ তার। মহাবাতুনের মতে, হস্টেলে ডাউট ক্লিয়ারিঙের আলাদা ক্লাস হলে এবং কঠিন ও নর্মাল প্রশ্নের সমাধানের ওপর সমান জোর দিলে নিটের সাফল্য সহজ হয়। বর্তমানে মহাবাতুনের দাদা স্নাতক মুস্তাফিজুর কাজে নিয়োজিত, দিদি স্নাতক মুসফেরা বিবাহিতা এবং বোন নুরসেবা একাদশ শ্রেণিতে পাঠরত। মহাবাতুন জানায়, "আমার এই সাফল্যে আমার মা ও পরিবার সবসময় পাশে থেকেছে। একাদশ শ্রেণিতে নামমাত্র ও নিটের জন্যে এক পঞ্চমাংশ বেতনে মিশনে পড়ার সুযোগ পেয়েছি বলেই আমার এই সাফল্য। ধন্যবাদ আল-আমীন মিশন পরিবারকে।" ■

রুবিনা খাতুন

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৪০০১৬

রায়গঞ্জ গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

“ভালো একটা নার্সিংহোম তৈরি করা যাবে। অসুস্থ ব্যক্তিরা ঠিক সময়ে ঠিক চিকিৎসা পাবে। আমাদের বসতিতে পাস-করা ডাক্তারও নেই। গ্রামে মহিলা চিকিৎসকও নেই। আমিই আমাদের পাড়ার প্রথম এম.বি.বি.এস. পড়ুয়া।”— সদ্য-প্রকাশিত ২০২৫-এর নিট (ইউজি)-এ সফল রুবিনা খাতুনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার রূপরেখা এটিই। মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার শুরপাড়া গ্রামের আইজুদ্দিন শেখ ছোটোখাটো ব্যাবসা করতেন। তাঁর পড়াশোনা চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত। বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি সুগার-প্রেশার-সহ বেশ কিছু শারীরিক উপসর্গে ভুগছিলেন। অমানুষিক পরিশ্রম করে ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা বিয়ে-শাদি সবকিছুই একা হাতে সামলেছেন। ২০১৯ সালে তাঁর ইন্তেকাল পরিবারের জন্যে ছিল বড়োই বিষাদময় ও কষ্টকর।

ওই বছর ছিল রুবিনার মাধ্যমিক পরীক্ষা। মাধ্যমিক পরীক্ষার কয়েক মাস পরেই তার আব্বার প্রয়াণ। ভগবানপুর কে বি এস হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিকে ৭৮.৮ শতাংশ নম্বর পেয়েছিল রুবিনা। পাশের গ্রামের আল-আমীনের প্রাক্তনী ডাক্তারি-পড়ুয়া রুবিনাকে মিশনে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন। সেই সূত্রেই একাদশ শ্রেণিতে মিশনের মালদা শাখায় ভর্তি হয়। মাসিক বেতন ছিল খুবই সামান্য। এখান থেকেই ৭৮.২ শতাংশ নম্বর নিয়ে ২০২১ সালে পাস করে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা। মনের সুপ্ত বাসনায় লুকিয়ে রাখা ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নকে সফল করতে রুবিনা মালদা থেকে পাড়ি জমায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুর শাখায়। দেশের অন্যতম কঠিন পরীক্ষা নিটের জন্যে শুরু করে নিজের প্রস্তুতি। ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৪ সালে যথাক্রমে ৩১১, ৪৪৭ ও ৫৭৩ নম্বর পেলেও সাফল্যের সীমা ছুঁতে পারেনি। পর পর ব্যর্থ হলেও তার ধৈর্য ও এনার্জি অটুট রাখতে পারে কেবলই তার মরহুম আব্বার কথা স্মরণ করে। এ-বছরের নিটে ফল বেরোলে দেখা যায় রুবিনা ৫১১ নম্বর পেয়ে সফল হয়েছে। স্বপ্ন পূরণ করে ফেলেছে এবং নিজের নামের পাশে জুড়ে নিয়েছে পাড়ার প্রথম এম.বি.বি.এস. ছাত্রীর গৌরব।

রুবিনার এই সাফল্য খুব সহজ ছিল না। রুবিনাদের বড়ো পরিবারের সাংসারিক খরচও কম ছিল না। রুবিনার আব্বা, তার চার দিদি ও এক দাদার বিবাহ সম্পন্ন করে গিয়েছেন। এখন তাদের বাড়িতে তার মা, এক দাদা ও এক বোন থাকেন। বর্তমানে গৃহকর্ত্রী রুবিনার মা নাইমারা চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন। দাদা আমির স্নাতক, অনলাইনের কাজ করেন। বোন রুম্পা কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। আব্বার ইন্তেকালের পরে আর্থিক প্রশ্নে স্বভাবতই অসুবিধায় পড়ে সংসার। বিঘে খানেক জমি থেকে সামান্য কিছু আয়ের মাধ্যমে সংসার চলত। এই পরিস্থিতিতে প্রায় ৬ বছর, বিশেষ করে ৪ বছরের নিটের কোচিং নেওয়া মিশনের সাহায্য ছাড়া কোনোমতেই সম্ভব হত না। নিটের পড়াশোনার মাসিক বেতন আগের চেয়ে আরও কম করে একেবারেই মিনিমাম করে মিশন। রুবিনার ইচ্ছে ভবিষ্যতে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হয়ে নিজ এলাকায় স্বাস্থ্যসচেতনতা গড়ে তোলা। সময় পেলেই মাকে বিশ্রাম দিয়ে রান্নাশালে ঢুকে পড়ে রুবিনা। ভারতীয় দু-জন প্রিয় ব্যক্তিত্ব— রুবিনার তালিকায় আছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম এবং মিশনের সেক্রেটারি এম নুরুল ইসলাম। রুবিনা জানায়, সকলেই বলত আল-আমীনে গেলে চিকিৎসক হওয়া যায়। আলহামদুলিল্লাহ্! আমারও স্বপ্ন পূরণ করেছে মিশন। ■

আমার বাড়ি শান্তিনীড়

তৃতীয় বছরে পদার্পণ করল
স্বপ্নের আবাসস্থল,
যেটি এতিম শিশুদের আধুনিক শিক্ষার
অতুলনীয় আশ্রয়কেন্দ্র।
যার নাম ‘শান্তিনীড়’।

আল-আমীনের লক্ষ্য ছিল
দরিদ্র এতিমরা ‘শান্তিনীড়’কে
আপন বাড়ি ভেবে
আধুনিক শিক্ষার জগতে প্রবেশ করবে।
মিশনের উদ্দেশ্য আজ সফল।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে
ভর্তির জন্য ফর্ম দেওয়া হবে

১৫ নভেম্বর ২০২৫ থেকে।

শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫।

ভর্তি নেওয়া হবে
হাওড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং
দক্ষিণ দিনাজপুর-এর বিভিন্ন কেন্দ্রে

আল-আমীন এডুকেশন কাউন্সিল পরিচালিত
আল-আমীন মডেল স্কুল খলতপুর
খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া

Al-Ameen Mission

A socio academic institution with a difference

NEET (UG) 2025

Brilliant Performance

474

Marks	Within AIR	Count
Marks 550 & above	Within AIR 12394	68
Marks 530 & above	Within AIR 24287	180
Marks 510 & above	Within AIR 41676	361
Marks 500 & above	Within AIR 52672	474
Marks 480 & above	Within AIR 78030	720

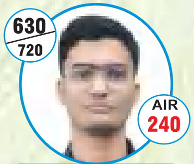
630/720 AIR 240 Syed Md Tamjeed

625/720 AIR 330 Arafat Hossain

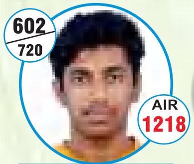
602/720 AIR 1218 Sarif Hasan

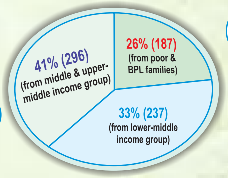

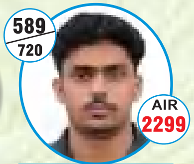
589/720 AIR 2299 Safiul Islam

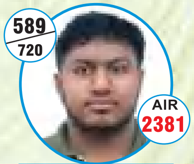
589/720 AIR 2381 Md Moinuddin Hassan

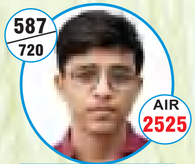
587/720 AIR 2525 Najmul Haque

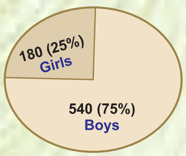

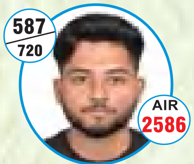
587/720 AIR 2586 Jonaid Mohamod

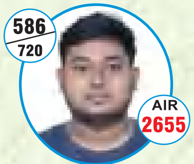
586/720 AIR 2655 Mustafijur Rahaman Galib

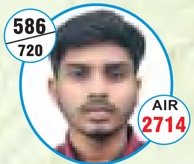
586/720 AIR 2714 Md Ariful Islam

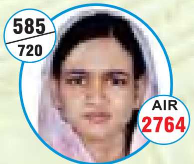
585/720 AIR 2764 Samima Biswas

583/720 AIR 3030 Samina Khatun

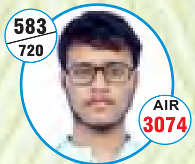
583/720 AIR 3074 Sk Nilay Islam

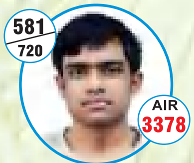
581/720 AIR 3378 Rafik Hassan

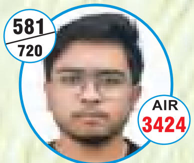
581/720 AIR 3424 Ainal Kabir

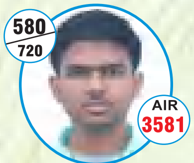
580/720 AIR 3581 Rasel Sk

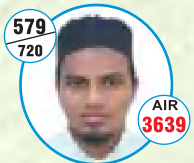
579/720 AIR 3639 Altamas Kabir Halder

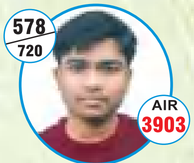
578/720 AIR 3903 Rizwanul Arefin

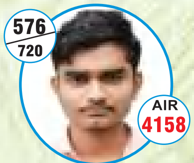
576/720 AIR 4158 Saim Molla

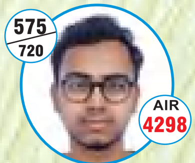
575/720 AIR 4298 Abdul Rajeb Sk

Higher Secondary (12th Std.) 2025

Board	Appeared		90%	80%	70%
WBCHSE	Boys & Girls	1771	246	1340	1726
CBSE	Boys & Girls	122	6	33	86
	Total	1893	252	1373	1812

Secondary (10th Std.) 2025

Board	Appeared		90%	80%	70%
WBBSE	Boys & Girls	2308	468	1611	2115
CBSE	Boys & Girls	314	92	222	282
	Total	2622	560	1833	2397

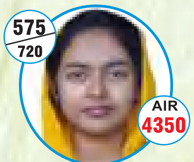
575/720 AIR 4350 Lubna Farhad Mondal

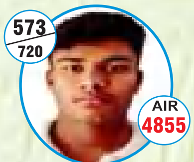
573/720 AIR 4855 Ahammad Hasan Ansari

572/720 AIR 4895 Roni Mondal

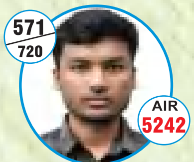
571/720 AIR 5242 Samim Akhtar

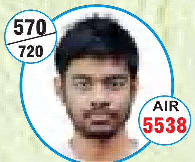
570/720 AIR 5538 Saharul Sk